wasef'20

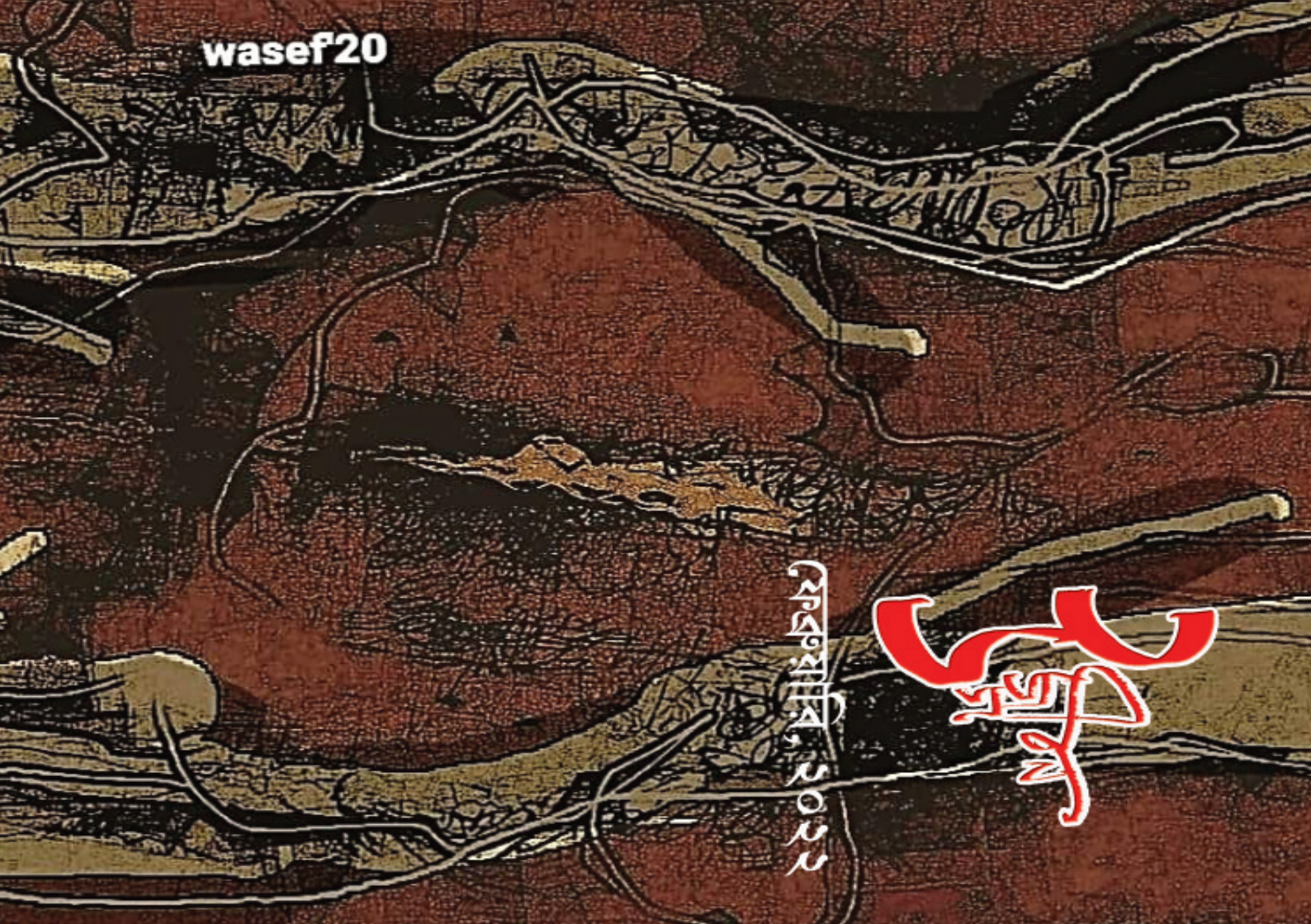

Al-Ameen Mission

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Ph.: 74790 20059
Central Office: 538 Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 74790 20076

SUCCESS AT A GLANCE : 2020

Dazzling Record in NEET (UG)

Marks 626 & above Within AIR 9908 **61**	Marks 600 & above Within AIR 20174 **134**	Marks 580 & above Within AIR 30431 **238**
Marks 565 & above Within AIR 39289 **322**	Marks 550 & above Within AIR 49260 **434**	Marks 536 & above Within AIR 59825 **516**

AIR 916 (675) Jisan Hossain

AIR 1276 (670) Tanbir Ahmed

AIR 1522 (666) Md Samim

AIR 1982 (662) Ayesha Khatun

AIR 2298 (660) Al Taufeeq

AIR 2817 (656) Kanon Akhtar

AIR 2947 (655) Md Tarip Sk

Higher Secondary (12th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBCHSE	Science	2090	909	1928	2072	2089
	Arts	79	43	66	78	79
CBSE	Science	54	8	24	43	54
	Total	2223	960	2018	2193	2222

Appeared 2223	
From Poor & BPL families	605 (27%)
From lower-middle income group	775 (35%)
From middle & upper middle income group	843 (38%)

81 students have occupied their positions within 20 ranks in the H.S. examinations of the Council

Secondary (10th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBBSE	Boys & Girls	1706	461	1211	1557	1668
CBSE	Boys & Girls	71	21	48	64	70
	Total	1777	482	1259	1621	1738

Appeared 1777	
From Poor & BPL families	627 (35%)
From lower-middle income group	680 (38%)
From middle & upper middle income group	470 (27%)

15 students have occupied their positions within 20 ranks in 10th exam.

নূরন্নেছা খাতুন

রচনা সংগ্রহ

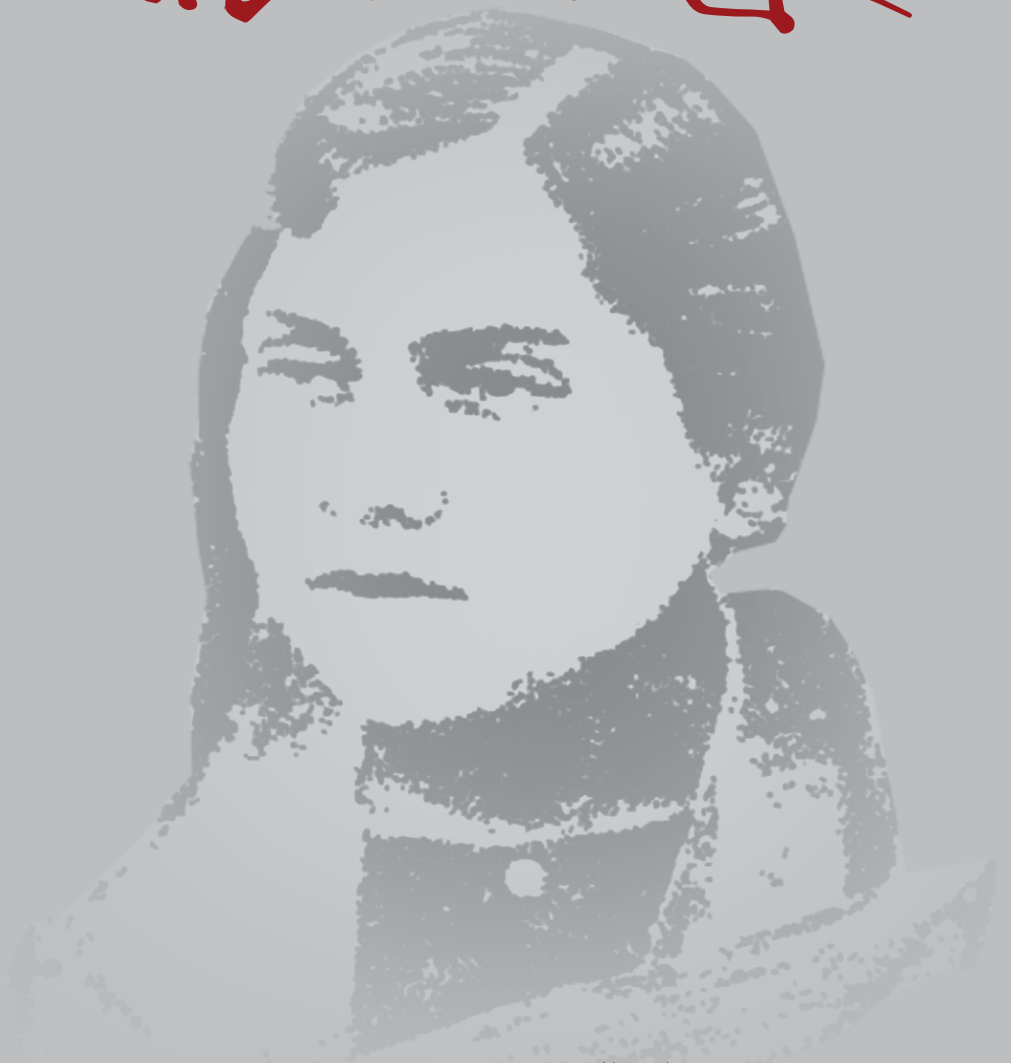

সংকলন ও সম্পাদনা

মীর রেজাউল করিম

আর নয় ভেলোর

M.R.HOSPITAL

Sharing Love, Caring Humanity

YOUR HEALTH IS OUR PRIORITY

আমাদের পরিষেবা সমূহ

- বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
- ফিজিক্যাল মেডিসিন
- ফেয়ার প্রাইস প্যাথলজি
- এন্ডোস্কপি
- ব্রঙ্কোস্কপি
- সি টি স্ক্যান
- সাইক্রিয়াট্রিক
- ই.এন.টি ও হেড নেক
- সার্জারি
- কেমোথেরাপি
- ডেন্টাল
- ফেসিও ম্যাগজিলারী
- সার্জারি
- জেনারেল মেডিসিন
- জেনারেল সার্জারি
- নিউরো ও স্পাইন সার্জারি
- ওপেন ও ল্যাপারোস্কপি
- সার্জারি
- কার্ডিওলজি
- পেসমেকার
- স্ত্রী-রোগ
- হাই-রিস্ক প্রেগন্যান্সি
- পোষ্ট কোভিড ক্লিনিক
- চোখের যাবতীয় চিকিৎসা
- ও.পি.ডি
- আ.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ.
- ২৪ ঘন্টার ইমাজেন্সিও টুমা
- কেয়ার
- জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট (কোমর ও হাঁটু)
- অত্যাধুনিক ল্যাবোরেটরি
- ডায়াগানেস্টিক
- ইন্ডোর ও আউটডোর পরিষেবা
- পেইন ক্লিনিক
- এক্স-রে
- ডায়ালিসিস
- ব্লাড ব্যাঙ্ক
- শিশু ও নবজাতক রোগ বিশেষজ্ঞ
- চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ
- শারীরিক ঔষধ ও পুর্নবাসন
- ইউ.এস.জি
- বক্ষ রোগ বিশেষজ্ঞ
- চর্ম রোগ বিভাগ
- ডায়াটেশিয়ান
- AC/ICU অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা
- ভরসা কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত
- স্বাস্থ্য পরিষেবা
- সকল প্রকার Health Insurance

M.R. HOSPITAL

Vill. & P.O - Balisha, P.S. - Ashoknagar , North 24 Parganas,
Near Bira Rail Station West Bengal , Pin - 743234

9734214214
9051214214

24/7 Emergency Services

www.mrhospital.org

মাসিক

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর মুখপত্র

ফেব্রুয়ারি ২০২২
কলকাতা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

কোষাধ্যক্ষ: মীর রেজাউল করিম

উজ্জীবন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

নির্বাহী সম্পাদক : জাহির আব্বাস

সম্পাদক মণ্ডলী : অনিকেত মহাপাত্র, আজিজুল হক, আবু রাইহান, আমিনুল ইসলাম, তৈমুর খান, পাতাউর জামান, ফারুক আহমেদ, মীজানুর রহমান, মুসা আলি, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, শেখ হাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সুজিতকুমার বিশ্বাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী : আলিমুজ্জমান, খাজিম আহমেদ, জাহিরুল হাসান, মিলন দত্ত, মীরাতুন নাহার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকমান হাকিম, সামশুল হক, স্বপন বসু

প্রচ্ছদ : ওয়াসেফুজ্জামান (**নাম-লিপি** : সম্বিত বসু)

বর্ণ সংস্থাপন : বর্ণায়ন

বিনিময় : ২৫ টাকা

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭

ই মেল : ujjibanmag@gmail.com, aliahsanskriti@gmail.com

ই মেল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

মীর রেজাউল করিম, ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (তৃতীয় তল),
কলকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, নিউ লেখা প্রকাশনী, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

'উজ্জীবন' আলিয়া-র রূপান্তরিত রূপ

স ম্পা দ কী য়

ভারতীয় সংসদের আদলে গড়া হয়েছে ‘ধর্মসংসদ’। এখানে ‘ধর্মে’-র কথা, শুভ-জীবনের কথা, আধ্যাত্মিকতার চর্চা হবে, এমনটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণ হয় না। এই মঞ্চ থেকে উগরে দেওয়া হয় গরল। ছড়ানো হয় হিংসা ও বিদ্বেষ। আহ্বান করা হয় সংখ্যালঘুদের গণহত্যার। রাষ্ট্রঋষি একটি নিন্দাবাক্যও ব্যয় করেন না এই সহিংস ঘোষণা বিষয়ে। সংখ্যালঘুরা এখন যাবে কোথায়? নিরাপত্তাহীনতাই কি তাদের নিত্যসঙ্গী? আক্রান্ত হতে হতে, দমিত হতে হতে, দলিত হতে হতে তাদের কাছে কি সবই এখন স্বাভাবিক ঠেকে? অনেকে মনে করে, সংখ্যালঘুদের হতে হয় ‘দার্শনিক’ অথবা ‘জেন সাধু’। কেননা, উদারতা ও উদাসীনতা শিক্ষা না করলে কোনও রাষ্ট্র-কাঠামোয় সংখ্যালঘু হয়ে টিকে থাকা কঠিন। তারা সংখ্যাগুরুর চোখে সন্দেহভাজন। তার অস্তিত্ব, তার প্রতিনিধিত্ব, তার অংশগ্রহণ, তার অবস্থান, তার প্রবেশ ও প্রস্থান—কিছুই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে কোনও ব্যক্তিকে। আন্তঃসম্পর্কগত নানাবিধ বিষয় রয়ে যায় সেখানে। কিন্তু রাষ্ট্রই যখন একাংশকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে ও সেই মতো আচরণ করে তখন এই ‘একাংশে’-র অসহায়তা অপরিমাপ্য। কেন এই বিদ্বেষ? সংখ্যালঘুরা জীবনে ও যাপনে কি এতটাই কদর্য যে হিংসা ছাড়া তাদের প্রতি কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না হৃদয়ে? আসলে এই অসহনীয়তার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। অতীতের ইসলামি শাসকদের প্রতি অসূয়াই প্রতিফলিত হচ্ছে বর্তমানের ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের ওপর। মুঘলরা নেই, কিন্তু মুসলমান রয়ে গেছে। ইতিহাস রচনা করার জন্য আর তথ্য-প্রমাণের দরকার হয় না। বিশ্বাসই ভিত্তি। অবিশ্বাস ও বিশ্বাসের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ রজ্জুর উপর পতনোন্মুখ সন্ত্রাসে কাঁপছে জাতির একাংশ। এই শ্রেণির সমস্ত গৌরবোজ্জ্বল আলোকস্তম্ভকে নিভিয়ে দিয়ে উপসংহার লেখা হচ্ছে যে, এদের সবটুকুই ‘অন্ধকার’। সেই বহু-বর্ণিত, সু-নির্মিত ও অতি-প্রচারিত অন্ধকারকে ‘শেষ সত্য’ বলে গ্রহণ করছে না তো জাতি? যাঁরা গণহত্যার সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশক তারা কি কখনও আকাশ দেখেন না? নক্ষত্রেরা কীভাবে সহাবস্থান করে তা কি গোচর হয় না? সেখানে ‘ধর্মসংসদ’ নেই, কিন্তু প্রকাণ্ড ‘ধর্ম’-ই বিরাজ করছে, যেন নিঃসীম।

সংসদ-সংবাদ

- গত ১৫ জানুয়ারি বৃহত্তর সমাজের কাছে সংসদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি-র পরিচয় তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি অনলাইন সভার আয়োজন করা হয়। আমজাদ হোসেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সভার কার্যক্রম। অতঃপর সাধারণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে।
- সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সভাগৃহ তৈরি, সংসদ-কার্যালয় স্থাপন, অতিথি নিবাস তৈরি (শহর কলকাতায় আমাদের জন্য সেইঅর্থে কোনো অতিথিনিবাস নেই) ইত্যাদির প্রেক্ষিতে সংসদের নিজস্ব ভবন গড়ে তোলার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- জনাব মহিউদ্দিন সরকার, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এককালীন ১০০০০/- (দশ হাজার টাকা) অনুদান হিসাবে দিয়েছেন। এ ছাড়াও অনেকেই সংসদ-ভবন নির্মাণের সাপেক্ষে এককালীন অর্থসাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন।
- আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, রবিবার সংসদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সভার আয়োজন করা হচ্ছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে বিকাল ৩টা থেকে এই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- গত বছরের মতো এবছরও প্রতিষ্ঠা দিবসের সাপেক্ষে নির্ধারিত তিনটি পুরস্কার অর্থাৎ শহীদুল্লাহ পুরস্কার, মশাররফ পুরস্কার ও রোকেয়া পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের প্রেক্ষিতে সংসদের ব্যবস্থাপনার প্রণীত পশ্চিমবঙ্গের সরকার পোষিত মাদ্রাসা বিষয়ক বিশেষ ডকুমেন্টারির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।
- প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রেক্ষিতে জীবনীমালার প্রথম তিনটি জীবনীগ্রন্থ—মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (সওগাত সম্পাদক), মুজিবর রহমান (দি মুসলমান সম্পাদক) ও ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী প্রকাশিত হতে চলেছে।
- জানুয়ারি ২০২২ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে দুটি আলেচনাসভা। যথা—
  ১. ইসলাম, দেশভ্রমণ ও ভ্রমণকাহিনি—আমজাদ হোসেন, ৮-০১-২০২২
  ২. ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব ও ভারত—সুমিতা দাস, ২২-০১-২০২২
- এখন থেকে ইংরেজি মাসের প্রথম শনিবার নিয়মিতভাবে অনলাইনে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট থেকে সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হবে।

গবেষণা
শেখ কামাল উদ্দীন। ৭

কৃতিকথা
আশরাফুল মণ্ডল। ১৯

বীক্ষণ
রোশেনারা খান ২৬

ভাষা-বীক্ষণ
মলয় মণ্ডল। ৩০

কাব্যচর্চা
রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম (অনুবাদ)
মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস। ৩৯

উপন্যাস
মেকাইল রহমান। ৫৪

গল্প
ফজলুল হক। ৬৩
সর্বানী বেগম। ৬৯

বঙ্গ-দর্পণ
বিকাশকান্তি মিদ্যা। ৭৩
আব্দুল বারী। ৭৯

বইচর্চা
তৈমুর খান। ৯৩

শিল্পচর্চা
সুবর্ণিকা ভট্টাচার্য। ৯৫

নিবেদন

আমরা আকাঙ্ক্ষা করি উজ্জীবন এর দর্পণে বিশেষ রূপে প্রতিবিম্বিত হোক আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি। বাংলার গ্রাম-গঞ্জের, এক একটি অঞ্চলের রয়েছে নিজস্ব সব ইতিহাস, ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের খনন ও নিষ্কাষণ আমরা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বলে জ্ঞান করছি। এ প্রেক্ষিতে প্রাজ্ঞসমাজের অনুগ্রহ কামনা করি।

বার্ষিক তিনশত (৩০০/-) টাকার বিনিময়ে 'উজ্জীবন' পত্রিকার গ্রাহক হন
স্বপ্রতিষ্ঠ হন সাংস্কৃতিক স্বভূমিতে

A/C 31590592615
IFSC SBIN0001299
PHONEPE : 7872422313
স্ক্রিন শর্ট প্রেরণ করা আবশ্যক

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৭৩২১৬৬৩৪৪
aliahsanskriti@gmail.com

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশনা

- সোহরাওয়ার্দী পরিবার : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার—আলিমুজ্জমান
- মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন—খন্দকার মাহমুদুল হাসান (জীবনীগ্রন্থ-১) (প্রকাশিতব্য)
- মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'—মিলন দত্ত (জীবনীগ্রন্থ-২) (প্রকাশিতব্য)
- ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী—সামশুল আলম (জীবনীগ্রন্থ-৩) (প্রকাশিতব্য)
- চরিতাভিধান প্রেক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজ (প্রকাশিতব্য)

শেখ কামাল উদ্দীন

মূল্যায়িত নজরুল : বিভ্রান্ত পাঠক ও গবেষক

নজরুল এমন একজন ব্যক্তি যিনি সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার পথে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেরত বন্ধুরা একে একে সরকারি চাকুরিতে যোগ দিচ্ছেন। নজরুলের জন্য একটা চাকুরি তখন অত্যাবশ্যক। সংসারে নিদারুণ দারিদ্র্য। ভয়াবহ এই দারিদ্র্যের লেলিহান শিখা থেকে আত্মরক্ষার সহজতম উপায় সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়া। একটা সময়ে মানসিকভাবে কিছুটা প্রস্তুতও হয়েছিলেন। কিন্তু শেষাবধি কর্তৃত্ব করেছিলেন নিজের নফসের উপর। সাহিত্যচর্চাকে করেছিলেন জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তারপরেরটা তো সবটাই ইতিহাস। কুড়ি বাইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সাহিত্য জীবনে কী না করেছেন তিনি। লিখেছেন নিরবচ্ছিন্ন ধারায়; রচনা করেছেন শত শত কবিতা, গান ও অসংখ্য গদ্য রচনা। তাঁর কবিতা ও গান বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে সে আসন চির অমলীন থাকারই নিকট সম্ভাবনা। নজরুল বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম। কবি হিসাবে জনকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমস্বরে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম।

এমন অনন্য সাহিত্য ব্যক্তিত্ব যে নজরুল তাঁর প্রতিভা ও সাহিত্যকৃতির পরিচয় প্রসঙ্গে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা কি বলেছেন একবার দেখে নেওয়া যেতে

পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে যাঁরা স্বনামধন্য, যাঁরা আমাদের অনেকেরই মাস্টারমশাই, যাঁদের লেখাকে আমরা আকরগ্রন্থ হিসেবে মেনে নিয়েছি এবং সেই অনুসারে নিজেদের তৈরি করার চেষ্টা করেছি, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই অগ্রগণ্য সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার এবং ক্ষেত্র গুপ্ত।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু পঠিত গ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' (ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত। এই গ্রন্থের ২৭৯ ও ২৮১ (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃষ্ঠায় কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে—

এক) "নজরুল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কয়েক বৎসর তরুণ বাঙালী সমাজে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, এই সময় কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া গিয়াছিল।"

দুই) "তিনি ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং দশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই বিদ্রোহী কবি ধূমকেতুর মতো নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন।"

তিন) "তাঁহার সর্বাধিক প্রচারিত কবিতা বিদ্রোহীর কেন্দ্রীয় বিষয়ে সংহতি নাই। সুরের মধ্যে এমনভাবে বিমিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, ইহাতে একমাত্র নির্জলা উত্তেজনা ভিন্ন অন্য কোন উচ্চতর রসমূর্তি লক্ষ্য করা যাইবে না। একমুখী বিপ্লবী উল্লাস একটু পরেই বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে; তখন পাঠক বিপ্লবী কবিকে ভুলিয়া যায়। নজরুলের সম্পর্কেও তাহাই হইয়াছে; আমাদের মনে হয় তিনি প্রেমের গান, গজল এবং ভক্তিসঙ্গীত রচনা না করিলে এতদিন পাঠক সমাজে বিস্মৃত হইয়া যাইতেন।"

এবার অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। প্রথম কথা, কাজী নজরুল ইসলাম বিংশ শতকের শুধু তৃতীয় দশক নয়; দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকের প্রথম দেড় বছর পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যকর্মে রত ছিলেন। তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতার কথা বলেছেন। 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২১-এ। যদিও তার আগে থেকেই তাঁর কবিতা বাংলার সেই সময়কার বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। আর তিনি যখন ১৯৪২-এর জুলাই মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন তখনও সৃষ্টিকর্মে সক্ষম ছিলেন। সুতরাং তাঁর সাহিত্য জীবন মোটেও দশ বছরের নয়। তাঁর সাহিত্য জীবন অন্তত ২১-২২ বছরের। কী করে অসিতবাবু কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন 'তৃতীয় দশকের কয়েক বৎসর' বলে উল্লেখ করলেন তা অজানা রয়ে গেল। দ্বিতীয় কথা, তিনি বললেন 'কাজী নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং ... ধূমকেতুর মতো নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন'। এ কথা ঠিক যে, বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ধূমকেতুর মতই; কিন্তু দশ বছর পূর্ণ হতে না হতেই বিদ্রোহী

কবি নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন! বর্তমান প্রজন্মের যাঁরা কাজী নজরুল ইসলামের রচনাবলি নিয়ে সামান্যও নাড়াচাড়া করেন তাঁরা কিছুতেই অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হবেন না। এই প্রবন্ধের পাঠকরাও কি একমত? যদি কাজী নজরুল ইসলাম নিষ্প্রভ হয়ে যেতেন তা'হলে এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজনই হতো না। শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা পৃথিবীতে যেখানে বাঙালি আছেন তাঁরাই কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে চলেছেন। তৃতীয়ত, তিনি বলেছেন কবির 'বিদ্রোহী' কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়ে সংহতি নেই, পাঠক বিপ্লবী কবিকে ভুলে যাবেন। তিনি প্রেমের গান, গজল এবং ভক্তিসংগীত রচনা না করলে এতদিন পাঠকসমাজে বিস্মৃত হয়ে যেতেন। মনে রাখতে হবে 'বিদ্রোহী' কবিতা কবির অল্প বয়সের রচনা। হ্যাঁ, কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়ে সংহতির অভাব থাকতে পারে। কেননা কবিতাটি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ব্যাপী বিস্তৃত। কবি বলেছেন—ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,/খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!' তিনি আরও বলেছেন—'আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার'। কখনো বা বলেছেন—'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন'।

এই প্রসঙ্গগুলি মর্তের নয়, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী স্বর্গের। কবি পাতালের প্রসঙ্গও এনেছেন—'আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা বারিধির'; আরও বলেছেন—'আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!' আর অবশ্যই, মর্তের কথা তো আছেই। দু'একটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে— 'আমি চির-শিশু, চির কিশোর/আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি/নিচোর!' কিংবা—'মম বাঁশরীর তানে পাশরি! আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী!' ইত্যাদি। ত্রিলোকব্যাপী বিস্তৃতি এই কবিতাটিকে নিঃসন্দেহে মহাকাব্যিক সুষমামণ্ডিত করে তুলছে; অনেক ছোটো বড়ো ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও।

'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষে সারা পৃথিবীব্যাপী যেভাবে আলোচনা হচ্ছে তাতে তো কখনোই মনে হয় না কবিকে বাঙালি পাঠক ভুলে যেতে পারেন। আর প্রেমের গান, গজল এবং ভক্তিসঙ্গীতের যে কথা তিনি বললেন তার বাইরে কাজী নজরুল ইসলামের আর কোনো সৃষ্টি নেই! তাঁর কৃষকের গান, শ্রমিকের গান, কুলি মজুরের গান, অন্তর ন্যাশনাল সংগীত, সৃষ্ট অসংখ্য রাগ-রাগিনী, তাঁর প্রবন্ধ, বিশেষ করে রাজবন্দীর জবানবন্দী', তাঁর নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, তাঁর অনুবাদ সাহিত্য— এগুলি থেকে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি কীভাবে হারিয়ে গেল! তাঁর এই মূল্যায়ন আমাদের ব্যথিত করে।

বাংলা সাহিত্যের আর একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত। তিনি আমাদের এই প্রজন্মের অনেকের মাস্টারমশাই বা আমাদের মাস্টারমশাইদেরও মাস্টারমশাই। তাঁর লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটির নাম 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'।

"নজরুলের কাব্যে পাশাপাশি দুটি ধারা চলেছে। প্রথম ধারাটি সাম্যবাদী চেতনাকে উত্তেজিত ভাষায় কাব্যভাত করেছে। এই চেতনা অবশ্য কোন বিশেষ মতবাদের বুদ্ধিসম্মত স্বীকৃতির পথ ধরে আসেনি, কবির আবেগ গভীরতা মন্থন করেই জন্ম নিয়েছে। কিন্তু এই রাজনীতি-চর্চা, উচ্চকণ্ঠ দরিদ্র-প্রীতি, সাম্যাজ্যবাদ-বিরোধিতা—চিন্তাধারা হিসেবে মহৎ হলেও উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম দেয়নি। নজরুলের জনপ্রিয়তা এই কারণেই। কিন্তু কবিতা হিসেবে এরা মূল্যবান নয়'।

তিনি তাঁর গ্রন্থটির ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন প্রকাশিত সংস্করণে কাজী নজরুল ইসলামের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন ২১৪ পৃষ্ঠার বইয়ের মধ্যে মাত্র কুড়িটি, হ্যাঁ ঠিকই পড়েছেন, কুড়িটি লাইন। এই কুড়িটি পংক্তিকে তিনি ছোটো ছোটো তিনটি অনুচ্ছেদে ভাগ করেছেন। এর অংশ বিশেষ—"নজরুলের কাব্যে পাশাপাশি দুটি ধারা চলেছে। প্রথম ধারাটি সাম্যবাদী চেতনাকে উত্তেজিত ভাষায় কাব্যভাত করেছে। এই চেতনা অবশ্য কোন বিশেষ মতবাদের বুদ্ধিসম্মত স্বীকৃতির পথ ধরে আসেনি, কবির আবেগ গভীরতা মন্থন করেই জন্ম নিয়েছে। কিন্তু এই রাজনীতি-চর্চা, উচ্চকণ্ঠ দরিদ্র-প্রীতি, সাম্যাজ্যবাদ-বিরোধিতা—চিন্তাধারা হিসেবে মহৎ হলেও উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম দেয়নি। নজরুলের জনপ্রিয়তা এই কারণেই। কিন্তু কবিতা হিসেবে এরা মূল্যবান নয়'।

আমাদের বোধ-বুদ্ধি হিসেবে ব্যাখ্যা—প্রথমত, লেখক কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে পাশাপাশি দুটি ধারার কথা বলেও প্রথম ধারাটির অতি সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ মাত্র করেছেন, আলোচনা নয়। দ্বিতীয় কোনধারা, সে বিষয়ে আলোকপাতই করেননি। যদি করতেন তা'হলে হয়তো আমরা তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান কিছু কথা কবির কাব্য সম্পর্কে জানলেও জানতে পারতাম। যাই হোক, দ্বিতীয় যে কথাটি আমরা বলতে চাই, লেখক শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্র গুপ্ত কবির কাব্যের প্রথম ধারা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রাজনীতি-চর্চা', 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা' এবং 'উচ্চকণ্ঠ দরিদ্র-প্রীতি'। এই 'উচ্চকণ্ঠ দরিদ্র-প্রীতি' শব্দবন্ধ নিয়ে আমাদের ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, কী প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে কবির বাল্যকাল

অতিবাহিত হয়। তার বিস্তৃত পরিচয় সকলেরই জানা। এমনকি পরবর্তীকালেও কবির জীবনে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ এসেছিল তা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিশেষ করে কৃষ্ণনগর অবস্থানকালে। তাঁর চিঠিগুলি পাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারি, কবি কীভাবে দশটি টাকার জন্য চিঠি লিখছেন। তার সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—'স্নেহের ব্রজ।—টাকার বড্ড দরকার। যেমন করে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ মারফত মণিঅর্ডার করে পাঠাও। তুমি ত সব অবস্থা জান। বলেও এসেছি তোমায়।' আবার 'কালিকলম' সম্পাদক মুরলীধর বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছেন,"---- আমি শুয়ে শুয়ে কয়েকটা গান লিখেছি উর্দু গজলের সুরে। তার কয়েকটা সওগাতে দিয়েছি। দুটো তোমার কাছে পাঠাচ্ছি বঙ্গবাণীতে দিয়ে আমায় তাড়াতাড়ি কিছু দিয়ে দেবার জন্য। অন্য সব জায়গায় দশ টাকা ক'রে দেয় আমার প্রত্যেকটা কবিতার জন্য, এ-কথা ওদের বলো। গান দু'টি পেয়েই যদি টাকাটা দেয় তাহলে আমার খুব উপকারে লাগে। আমাদের আর মান-ইজ্জত রইল না, মুরলী দা,—না! অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকে কেড়ে নেয় শেষে" (২৬/১২/২৬)।

চিঠির এই ভাষ্য কি কবির 'দরিদ্র-প্রীতি' না তাঁর অসহায়তা! মাননীয় ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখলেন না, নাকি কোনো রকম ভাবে এড়িয়ে গেলেন! আমরা সমালোচকের এই উক্তিতে বিস্মিত। কবি লিখেছিলেন, 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।' এই উচ্চারণ কি কবির 'দরিদ্র-প্রীতি', না অসহনীয় দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ? পাঠকের উপর আমরা এই প্রসঙ্গ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিচ্ছি। তৃতীয়ত, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাগুলোকে ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় কবিতা হিসেবেই গণ্য করতে চাননি। কখনো বলেছেন, উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম দেয়নি; কখনো বলেছেন, কবিতা হিসেবে মূল্যবান নয়। যাঁকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সংবর্ধনা সভায় পাশে বসিয়ে কবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যাঁকে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম 'মৌলিক কবি' বলে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, তাঁর কবিতাকে ক্ষেত্র গুপ্ত কবিতা বলে মান্যতা দিতে চাইলেন না! আবারও বলছি পুরো বিষয়টি আমরা পাঠকের উপরেই ছেড়ে দিয়ে বলতে চাই কবির চিন্তা, চেতনা, দর্শন তাঁর লেখা কবিতায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা বোধ হয় খুব কম কবির কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। মাননীয় ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয়ের এই উক্তি কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামকে ছোটো করে না তো বটেই বরং আমরাই সমালোচকের এই ধরনের বক্তব্য পড়ে কষ্ট পাই।

সবাই যে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা ক্ষেত্র গুপ্তের মূল্যায়নকে সমর্থন করেছেন তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রে আমরা শ্রীভূদেব চৌধুরী মহাশয়ের মূল্যায়নকে স্মরণে আনতে পারি। মাননীয় শ্রীভূদেব চৌধুরী মহাশয়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটির নাম, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'। উক্ত গ্রন্থে মাননীয় চৌধুরী বলেছেন '২৩-২৫ বছরের

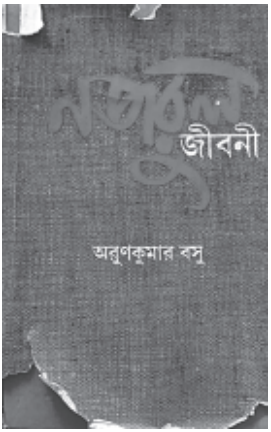

শিল্পী জীবনে (নজরুলের) অন্তত সাড়ে পাঁচশ রচনা তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়।' এই বক্তব্য দিয়ে অনায়াসেই অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতকে আরও একবার খণ্ডন করতে পারা যায়। শ্রী চৌধুরী নজরুলের গদ্য রচনা সম্পর্কে একটা জায়গায় বলেছেন—"নজরুল ইসলামের গদ্য রচনাশৈলীর জ্বলজ্যান্ত ছবি আছে, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'-তে।"

একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা সম্পর্কে শ্রীভূদেব চৌধুরী মহাশয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তাঁর গ্রন্থে—'স্বল্পবিত্ত গ্রামীণ মানুষের অনুভবের সঙ্গে পরিশীলিত মধ্যবিত্ত ভাবাদর্শের, হিন্দু-পুরাকথার অন্তরঙ্গে আন্তরিক ইসলামী প্রত্যয়কে জড়িয়ে এক সর্বভারতীয় জীবন-ঐতিহ্যের লালন এবং উন্মোচন ঘটেছে নজরুলের কবিতায়'। কী অপরিসীম প্রত্যয় নিয়ে কথাগুলো তিনি বলেছেন ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়! কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় শুধু বাংলা বা বাঙালিয়ানা নয়, একটি সর্বভারতীয় জীবন-ঐতিহ্যের সন্ধান পেয়েছেন শ্রীভূদেব চৌধুরী।

কাজী নজরুল ইসলাম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছেন কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরে অবস্থান, রচনা, সেখান থেকে প্রেরিত চিঠিপত্র সম্পর্কেও গবেষকরা বিশেষত ওপার বাংলার স্বনামধন্য রফিকুল ইসলাম ও এপার বাংলার মাননীয় অরুণকুমার বসু, যাঁদের দু'জনেরই বইয়ের নাম 'নজরুল জীবনী', সেখানেও নানারকম অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। সেই অসঙ্গতি অনিচ্ছাকৃত কিনা তথ্যসহকারে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে নতুন করে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দু'জনের এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রাবন্ধিকের লিখিত বক্তব্য এই প্রসঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কৃষ্ণনগরে কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম কবে এসেছিলেন সে নিয়ে তাঁর জীবনের অন্যান্য অনেক দিনক্ষণের মতই সঠিক তথ্য যথার্থভাবে জানা না গেলেও মোটামুটি ভাবে বেশিরভাগ নজরুল জীবনীকার বলেছেন, তিনি ১৯২৬ সালের একদম শুরুর দিকে কৃষ্ণনগরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। যেমন, অরুণকুমার বসু তাঁর বিখ্যাত 'নজরুল জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জিনিসপত্র গোছগাছ করে প্রমীলা ও গিরিবালা দেবীকে নিয়ে জানুয়ারির তিন তারিখে নজরুল এলেন কৃষ্ণনগরে' (পৃ ১৮২)। বাংলাদেশের প্রখ্যাত নজরুল জীবনীকার, জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তাঁর 'নজরুল জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখে (পৌষ ১৩৩২)

নজরুল কৃষ্ণনগর যান"(পৃ ২২৬)। মোহিত রায় তাঁর কৃষ্ণনগর থেকে 'নজরুল-লিখিত পত্রাবলী'- তে লিখছেন, 'হুগলি থেকে অসুস্থ নজরুলকে সপরিবারে কৃষ্ণনগরে ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়ে আসেন নজরুলবন্ধু হেমন্তকুমার সরকার' (গ্রেস কটেজ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মারক সংকলন ২০১৯)। অন্য দুটি মতও পাওয়া যাচ্ছে। সঞ্জীব রাহা তাঁর 'কৃষ্ণনগরে কাজী' প্রবন্ধে লিখছেন, 'কৃষ্ণনগরের সালতামামি: ১৯২৪ : কথিত আছে (নজরুল) প্রথম কৃষ্ণনগরে আসেন রোয়িং ক্লাবের মাঠে। কবি ঐ সভায় 'জাতের নামে বজ্জাতি' গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন।' (গ্রেস কটেজ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মারক সংকলন ২০১৯)। যদিও তিনি পাকাপাকিভাবে নজরুলের কৃষ্ণনগরে আসার তারিখটি বলেন, ১৯২৬ সালের ৩রা জানুয়ারি। আকবর উদ্দিন তাঁর 'চাঁদসড়কে নজরুল' প্রবন্ধে লিখছেন, 'রফিকুল ইসলামের নজরুল নির্দেশিকা'-য় বলা হয়েছে; নজরুল ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগর এসেছিলেন ও ১৯২৮ সালের শেষদিকে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করেছিলেন। এই হিসেবে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। ১৯২৫ সালের শেষদিকে নজরুল হুগলি থেকে কৃষ্ণনগর বাস করতে এসেছিলেন, ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় চলে যান' (গ্রেস কটেজ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মারক সংকলন ২০১৯)। এই আকবর উদ্দিন কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন নজরুলের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, 'নজরুল ছিলেন আমার অতি নিকট প্রতিবেশী—মাঝে শুধু একটা ছোট আমবাগান।' ফলে তাঁর বক্তব্যও ফেলে দেওয়ার নয়, যদিও তিনি বলেছেন, 'দিন তারিখ মাসগুলো স্মৃতির কোঠা থেকে হারিয়ে গিয়েছে।'

নজরুল কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন হুগলি থেকে। হুগলি থেকে তাঁকে কৃষ্ণনগরে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অন্যতম প্রধান সহকারী ছিলেন। কৃষ্ণনগরে নজরুল এলেন, কিন্তু থাকবেন কোথায়? প্রথমে নজরুল ওঠেন হেমন্তকুমার সরকারের বড়ো ভাই জ্ঞানচন্দ্র সরকারের একটা বাড়িতে। এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে। দু'জন প্রোথিতযশা নজরুল জীবনীকার হেমন্তকুমার সরকারদের বাড়িতে থাকার বিষয়ে দু'রকম কথা বলেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই দু'জন নজরুল বিশেষজ্ঞ দু'রকম কথা বলেছেন তাঁদের বইতে। রফিকুল ইসলাম তাঁর 'নজরুল জীবনী'-তে লিখেছেন—'প্রথমে তিনি হেমন্তবাবুর গোয়ালপট্টির বাসভবনের একটি অংশ ভাড়া নিয়ে বসবাস করতে থাকেন'। অরুণকুমার বসু তাঁর 'নজরুল জীবনী'-তে লিখেছেন—'বিনা ভাড়ায় বাড়ি, অন্যান্য ঋণশোধেরও ব্যবস্থা হয়েছে, মাঝেমাঝে বাজার করে দেওয়ারও সুবিধেজনক আয়োজন হল। আর কী চাই'। ভাড়া নেওয়া, না নেওয়ার থেকেও যা অনায়াসে দৃষ্টিগ্রাহ্য সেটি হল, একজন ভারতীয় লেখক লিখছেন ভারতের একটি অংশে একজন ভারতীয়র বাড়িতে বসবাসের

জন্য কাজী নজরুল ইসলামের কাছ থেকে কোনো ভাড়া নেওয়া হয়নি। আর একজন বাংলাদেশের লেখক লিখছেন, ভারতেরই একজন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ভারতেরই একটি জায়গায় একজন ভারতীয়ের বাড়িতে থাকার জন্য বাড়ি ভাড়া দিতে হচ্ছে। দুই ভিন্নদেশি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাই এখানে লক্ষণীয়। অবশ্য বেশিদিন নজরুল সেখানে থাকেননি। প্রথমত, জায়গাটি ছিল ঘিঞ্জি। দ্বিতীয়ত, কিছুটা অস্বাস্থ্যকরও বটে। তিনি এসে ওঠেন কৃষ্ণনগর শহরের চাঁদসড়ক নামক মুসলমান ও রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান অধ্যুষিত মহল্লায়। জায়গাটি বেশ বড়ো। কয়েক বিঘা জমির একপ্রান্তে আমবাগান। খোলামেলা পরিবেশ। এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠবে, রফিকুল ইসলাম কবির থাকার জায়গা হিসেবে মুসলমান ও রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান অধ্যুষিত চাঁদসড়কের কথা বলতে গেলেন কেন? যদিও এ বিষয়ে অরুণকুমার বসু কিছু বলেননি। তবে একটি তথ্য আমরা পাচ্ছি, নির্মল সান্যালের লেখা 'কৃষ্ণনগরে নজরুল এবং তার আগে ও পরে' প্রবন্ধে, যেটি গ্রেস কটেজ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মারক সংকলন, ২০১৯ গ্রন্থে

> 'স্বল্পবিত্ত গ্রামীণ মানুষের অনুভবের সঙ্গে পরিশীলিত মধ্যবিত্ত ভাবাদর্শের, হিন্দু-পুরাকথার অন্তরঙ্গে আন্তরিক ইসলামী প্রত্যয়কে জড়িয়ে এক সর্বভারতীয় জীবন-ঐতিহ্যের লালন এবং উন্মোচন ঘটেছে নজরুলের কবিতায়'।

সংকলিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'কিন্তু হুগলির মতো কৃষ্ণনগরেও নজরুলকে প্রতিবেশীদের অসন্তোষ ও বিরূপতার মুখে পড়তে হয়। হিন্দু পল্লীতে একজন মুসলমান সপরিবার বাস করবেন এতে অনেকেই ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হন' (পৃ ৯৮)। অবশ্য এমন ঘটনা নজরুলের জীবনে বরাবরই ঘটেছে। সুতরাং নির্মল সান্যালের বক্তব্যে যৌক্তিকতা থাকতেও পারে।

শুধু কৃষ্ণনগরে অবস্থান নিয়ে নয়, মাননীয় রফিকুল ইসলাম ও মাননীয় অরুণ কুমার বসুর গ্রন্থে, যে গ্রন্থ দু'টিকে আমরা নজরুল গবেষণায় আকর গ্রন্থ হিসেবে মান্যতা দিয়ে আসছি সেই গ্রন্থ দু'টিতে একাধিক বিষয়ে মতান্তর লক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাঁদের গবেষণাকে ছোটো করে দেখানো, সেই স্পর্ধা বা সাহস দেখানো এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য নজরুল গবেষণায় আরও সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়, না হলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ভুল বার্তা

যাবে; বিশেষ করে যারা একটি গ্রন্থকে অবলম্বন করবেন তারা অন্য অনুসারীদের রোষের মুখে পড়তে পারেন। এবার দেখা যাক দু'জনের গ্রন্থে কী ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রথমত, দুটি গ্রন্থেই কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম সাল ও তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ইংরাজি ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে মোতাবেক ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ। সাল, তারিখ নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু গোল বেধেছে সেদিন কি বার ছিল, তা নিয়ে। রফিকুল ইসলাম বলেছেন, 'মঙ্গলবার এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত', আর অরুণকুমার বসু বলেছেন, সেদিনটি ছিল বুধবার। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে শেষ প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলাম রচনাবলি-তেও তাঁর জন্ম তারিখ বুধবার বলা হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের পিতা ফকির আহমেদ। তাঁর দুই স্ত্রীর একজনের নাম জানা যায় না আর একজন জাহেদা খাতুন; এই তথ্য সর্বজনমান্য হলেও একটি বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই অরুণকুমার বসু। তিনি তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বলেছেন—'নজরুল তাঁর পিতার কোন স্ত্রীর গর্ভজাত তার স্পষ্ট উল্লেখ অন্যান্য জীবনীকার সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন।' আমাদের বক্তব্য, 'সন্তর্পণে' মানে কি? জেনে, বুঝে যে, কাজী নজরুল ইসলামের মাতা জাহেদা খাতুন নয়! এই বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে কয়েকটি নজরুল জীবনীগ্রন্থের শরণাপন্ন হই; কিন্তু সেখানে কোথাও এমন তথ্য নেই যে জাহেদা খাতুন কাজী নজরুল ইসলামের গর্ভধারিণী নন।

শুধু কৃষ্ণনগরে অবস্থান নিয়ে নয়, মাননীয় রফিকুল ইসলাম ও মাননীয় অরুণ কুমার বসুর গ্রন্থে, যে গ্রন্থ দু'টিকে আমরা নজরুল গবেষণায় আকর গ্রন্থ হিসেবে মান্যতা দিয়ে আসছি সেই গ্রন্থ দু'টিতে একাধিক বিষয়ে মতান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাঁদের গবেষণাকে ছোটো করে দেখানো, সেই স্পর্ধা বা সাহস দেখানো এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য নজরুল গবেষণায় আরও সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়, না হলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ভুল বার্তা যাবে;

তা'হলে অরুণকুমার বসু এমন একটি কথা বলতে গেলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এখন আর জানা সম্ভব নয়, কেননা তিনি প্রয়াত।

দ্বিতীয়ত, এবার দেখা যাক কাজী নজরুল ইসলামের সেনাবাহিনীতে যোগদান সম্পর্কে দু'জন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক কি বলেছেন। রফিকুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—'১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি ঠিক কোন তারিখে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তা জানা যায় না। তবে বিভিন্ন তথ্য থেকে এটুকু জানা যায় যে শৈলজানন্দের কোয়ার্টারলি পরীক্ষার পর এবং নজরুলের প্রি-টেস্ট পরীক্ষার আগে নজরুল সৈনিক হন। তাতে মনে হয় নজরুল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।'' অরুণকুমার বসু এই ব্যাপারে কি বলেছেন, দেখা যাক। তিনি লিখেছেন—'১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে স্কুলের প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলেন নজরুল। তারপরই ছিন্ন-শিকল-পায়ে তাঁর ওড়ার পালা শুরু হল'। কী করে কাজী নজরুল ইসলামের মতো একজন এত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক, তিনি তারিখ বাদ দিলেও কোন মাসে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন সেইটুকু তথ্য দু'জন বিশিষ্ট নজরুল জীবনীকার দু'রকম বলবেন! এর ফলে যারা একটি গ্রন্থ পড়ছেন তারা সেই গ্রন্থ অনুসারে মাস, তারিখ বলবেন, আর যারা অন্য গ্রন্থটি পড়ছেন তারা তার বিরোধিতা করবেন। এর ফলে নজরুল অনুরাগীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। এই বিভ্রান্তি দূর করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও 'একুশে পদক' নিয়েও দু'জনে দু'রকম কথা বলেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম যখন বাংলাদেশে ছিলেন সেই সময় তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং সে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'একুশে পদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এ ব্যাপারে তাঁরা কেন, আমরা সকলেই সহমত, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সাল, তারিখ নিয়ে এবং শুধু সাল-তারিখ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তদানীন্তন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও। অরুণকুমার বসু তাঁর 'নজরুল জীবনী'-তে লিখেছেন, ''১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকার একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'একুশে পদক' কবিকে প্রদান করেন এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়'' (পৃ. ৫৩০)। এবার দেখা যাক, রফিকুল ইসলাম তাঁর 'নজরুল জীবনী' গ্রন্থে একই বিষয়ে কী বলেছেন। তিনি

লিখেছেন—'১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং ২১শে ফেব্রুয়ারিতে একুশে পদক'এ ভূষিত করেন'। মনে হতে পারে যে, এটি রফিকুল ইসলাম সাহেবের গ্রন্থের মুদ্রণ-প্রমাদ। ১৯৭৫ সালই হবে, ১৯৭৬ সালের পরিবর্তে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে, রফিকুল ইসলামের বইটি থেকে যদি কেউ উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বাংলাদেশে নজরুলের নাগরিকত্ব প্রদান এবং একুশে পদকে সম্মানিত হওয়ার সাল হিসেবে ১৯৭৬ লেখেন তাহলে সেটি কি ভুল হবে, না ঠিক হবে? এইটা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কেবল সাল তারিখের ব্যাপার নয়। কারণ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট একটি বড়ো ঘটনা ঘটে গেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির পিতা' মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। আর মনে রাখতে হবে মুজিবুর রহমানের বিশেষ অনুরোধেই কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালনের জন্য কবিকে বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' সংগীতকে যেমন সে দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেন, অনুরূপভাবে কাজী নজরুল ইসলামের 'চল চল চল' গানটিকে সে দেশের রণসংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং 'নজরুল ইসলামকে বঙ্গবন্ধু' জীবিত অবস্থায় নাগরিকত্ব প্রদান করেছিলেন এবং 'একুশে পদক' দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন বলেই মনে করা সঙ্গত। আর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ হলে তখন 'বঙ্গবন্ধু' নিহত হয়েছেন এবং বাংলাদেশে একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সরকার কাজী নজরুল ইসলামকে 'একুশে পদক' এবং সে দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেছিলেন যা মুজিবুর রহমান করে যেতে পারেননি বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়! অবশ্য এখানে বিশ্বাস বড়ো নয়, বড়ো কথা হচ্ছে তথ্য-প্রমাণ। সুতরাং নজরুলকে নিয়ে দুই বাংলায় যে গবেষণা গ্রন্থ রচিত হচ্ছে সে ব্যাপারে লেখকদের আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলামকে ১৯৭৬ সালেই 'একুশে পদক' দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৬-এর আগে 'একুশে পদক' প্রদানের ব্যবস্থাই ছিল না। সেই বছর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে কবি জসীমউদ্দিনকেও 'একুশে পদক' দেওয়া হয়।

চতুর্থত, অসুস্থ কবির চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়েও দু'জন নজরুল-জীবনীকার দু'রকম তথ্য পরিবেশন করেছেন। এখানেও কী বলা হবে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে! নাকি তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনে চরম অবহেলা দেখানো হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম; আমরা সকলেই জানি তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সরাসরি সম্প্রচার মূলক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হলে তিনি সেখানে বসেই একটি কবিতা রচনা ও পাঠ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ শোকযাত্রার ধারাবিবরণীও তিনি দিয়েছিলেন। একটি কবিতা রচনা করেই তিনি তাঁর কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে ক্ষান্ত হননি! তিনি অনেকেরই প্রয়াণে তৎক্ষণাৎ কবিতা লিখে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন আর কবিগুরু তো ছিলেন তাঁর কাছে পরম শ্রদ্ধার মানুষ। পরে তিনি আরও কয়েকটি গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন। আর তার পরের বছর ১৯৪২-এর জুলাই মাসে কবি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারিখটি রফিকুল ইসলামের মতানুসারে এইরকম—'নজরুল ব্যাধিগ্রস্ত হন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই এবং নির্বাক হন আগস্ট মাসে'। আর একজন বিদগ্ধ নজরুল-জীবনীকার, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অরুণকুমার বসু তাঁর 'নজরুল জীবনী' গ্রন্থে কী লিখছেন! লিখেছেন, 'রাচি পাঠানোর প্রস্তাব বাতিল করে নজরুলকে ২৫শে অক্টোবর ১৯৪১ তারিখে তিলজালা লুম্বিনী মানসিক হাসপাতালে ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর তত্ত্বাবধানে ভর্তি করানো হলো'। অর্থাৎ যে সময়ের কথা অরুণকুমার বসু বলেছেন সেই সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থই হননি।

পঞ্চমত, শ্রদ্ধেয় অরুণকুমার বসু তাঁর 'নজরুল-জীবনী'-তে উল্লেখ করেছেন—'নজরুল তখন জীবিতদেহ বোধরোহিত অন্তরীণ বন্দীর মতো ধানমন্ডির নির্দিষ্ট বাসভবনে সরকার-প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছেন'। জীবনীকার একইসঙ্গে বলছেন 'বোধরোহিত', আবার 'ভোগ করে আসছেন'। কি করে একজন বাকরুদ্ধ মানুষ কোনো কিছু ভোগ করতে পারেন? তিনি কি ভোগ করতেন? মনে রাখতে হবে কবিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হলেও পরবর্তীকালে তিনি আর এ দেশে ফিরে আসতে পারেননি। কেন পারেননি, সে নিয়েও কিছুটা হলেও বিতর্ক আছে। কিন্তু যেহেতু তাঁকে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তাই তাঁর দেখাশোনা করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চিকিৎসক দল তৈরি করা হয়; তাঁরা সর্বক্ষণ কবিকে দেখভাল করতেন। প্রথমদিকে কবিপুত্র সব্যসাচীর স্ত্রী উমা কাজী ও তাঁর কন্যা খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজী প্রমুখরা ছিলেন। আর ছিলেন স্থানীয় সেবক, বিশেষ করে শফি চাকলাদার। কিন্তু যে কবির, অরুণকুমার বসুর কথামতো 'আপনজনের, পরিবার-স্বজনের বোধ ছিল না' তিনি সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন, এই শব্দ-বন্ধে আমরা অত্যন্ত জোরালো ভাবে আপত্তি জানাচ্ছি। জানি না, এই প্রসঙ্গে পাঠক কী প্রতিক্রিয়া জানাবেন?

আশরাফুল মণ্ডল

সুফিয়া কামাল : সৃজনে ও সমাজকর্মে

'আমরা জন্মেছিলাম এক আশ্চর্যময় রূপায়ণের কালে। প্রথম মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম রেনেসাঁর পুনরুত্থান, রাশিয়ান বিপ্লব, বিজ্ঞান জগতের নতুন নতুন আবিষ্কার, সাহিত্য-সংস্কৃতির নবরূপ সূচনা, এসবের শুরু থেকে যে অভাবের মধ্যে শৈশব কেটেছে তারই আদর্শ আমাদের মনে ছাপ রেখেছে সুগভীরভাবে।'

('একালে আমাদের কাল'—সুফিয়া কামাল)

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ঠিক শুরুতেই আবির্ভূত এক উল্লেখযোগ্য কবি ব্যক্তিত্ব সুফিয়া কামাল। ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদ নবাব পরিবারে জন্ম হয় তাঁর। সুফিয়া কামালের ডাকনাম ছিল হাসনা বানু। তাঁর আব্বাজান আবদুল বারি পেশায় ছিলেন আইনজীবী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যখন সুফিয়া নেহাতই বালিকা তখন

তাঁর আব্বাজান নিরুদ্দিষ্ট হন। সুফিয়ার মা সৈয়দা সাবেরা খাতুন মেয়েকে খুব আদর যত্ন সহকারে যথার্থই বড়ো করে তোলার চেষ্টা করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার সুফিয়া শায়েস্তাগঞ্জে তাঁর নানাজানের বাড়ির অভিজাত রক্ষণশীল প্রতিবেশে দীর্ঘ দিন থাকলেও তাঁর মনোগঠনে দেশ, দেশবাসী, সমাজ, ভাষা-সংস্কৃতি মূল প্রেরণা হিসেবে তাঁকে উজ্জীবিত করে।

সুফিয়া কামাল তেমনভাবে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাননি। তিনি নিজের অদম্য ইচ্ছায় সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের গৃহে উর্দু ভাষার চল থাকলেও অদম্য উৎসাহে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। পরিবারে দীর্ঘকাল প্রচলিত পর্দার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন প্রকৃত অর্থেই আধুনিক নারী।

১৯২৩ সালে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এসময় বয়স মাত্র বারো বছর। উদারচেতা স্বামী তাঁকে সমাজসেবায় ও সাহিত্যচর্চায় বেশ উৎসাহ দিতেন। ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধীর হাতে তিনি চরকায় কাটা সুতো তুলে দিয়েছিলেন। সামাজিক ও পারিবারিক বাধার অজস্র টিলা পেরিয়ে ১৯২৮ সালে বাঙালি পাইলট চালিত বিমানে উঠলেন সুফিয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রমুখের প্রভাব ও সহযোগিতায় তাঁর কর্মনিষ্ঠ জীবন বিকশিত হয়েছে কৈশোর থেকে তারুণ্যে।

সুফিয়া কামাল মাত্র একুশ বছর বয়সে ১৯৩২ সালে বিধবা হন। ১৯৩৯ সালে কামালউদ্দিন খানের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। অল্পবয়সেই তাঁকে অজস্র স্বজন হারানোর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। ১৯৪১ সালে তিনি মাকে হারান। ১৯৬৩ সালে

তাঁর নয়নের মণি পুত্র শোয়েব প্রয়াত হয় এবং ১৯৭৭ সালে দ্বিতীয় স্বামী কামালউদ্দিন খানও প্রয়াত হন। তিনি নিজে ১৯৯৯ সালে ২০ নভেম্বর বাংলাদেশের ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুফিয়া কামালের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইগুলো হল: সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), উত্তপ্ত পৃথিবী (১৯৬৪) প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রথমটি কাব্যগ্রন্থ। অন্যগুলি গদ্যভাষাশ্রিত রচনা।

১৯২৩ সালে রচিত তাঁর প্রথম গল্প 'সৈনিক বধু' বরিশালের 'তরুণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর অসাধারণ কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ হল: সোভিয়েটের দিনগুলি (১৯৬৮), ভ্রমণ কাহিনী, একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)। আত্মজীবনীমূলক রচনা একাত্তরের ডায়েরী(১৯৮৯)।

তাঁর অগ্রন্থিত রচনাগুলো হল: 'অন্তরা'- (অসম্পূর্ণ উপন্যাস)। এটি বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ থেকে পাঁচ কিস্তিতে কলকাতার মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'জনক'-(নভেলা বা ছোট্ট উপন্যাস)। এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়ায় স্বাস্থ্য নিবাসে অবস্থানকালে ১৯৭৭ সালের ৬ থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে মাত্র পনেরো দিনে রচনা করেন। তাঁর বহু কবিতা চিনা, ইংরেজি, ইতালিয়ান, জার্মান, পোলিশ, রুশ, ভিয়েতনামিজ, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা'। এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯৮৪ সালে রুশ ভাষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে বাংলা একাডেমী তাঁর কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ দিয়ে 'Mother of pears and other poem' প্রকাশ করেছে।

সাহিত্যচর্চার জন্য অজস্র পুরষ্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। যেমন—বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার বেগম রোকেয়া পদক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বর্ণ পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার প্রভৃতি। এছাড়া তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের Lenin centenary jubilee Medel এবং Czechoslovakia Medel সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। সুফিয়া কামাল গদ্য লেখক হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ঠিকই, তবে সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। প্রকৃতি, সমাজ, প্রেম, স্বদেশ বিষয়ক অজস্র কবিতা তিনি লিখেছেন। এই কবিতাগুলোতে তাঁর কবিত্ব শক্তির প্রকাশ পাঠককে মুগ্ধ করে।

তাঁর কবিতা সমগ্রের নিবিড় পাঠে আমরা বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, শুধু নিজের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাভাষা ও সাহিত্য পাঠে ব্রতী হয়েছিলেন এবং সাহিত্য রচনার জন্য কলম ধরেছিলেন। 'সওগাত' পত্রিকায় ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় সুফিয়া কামালের প্রথম কবিতা 'বাসন্তী'। কবিতাটির অংশবিশেষ:

- 'ওগো ক্লান্ত দিবাকর! তব অস্ত উৎসবের রাগে হেথা মর্ত্যে বনানীর পল্লবে
  পল্লবে দোলা লাগে।
  শেষ রশ্মিরে বিদায়ের ব্যথিত চুম্বন পাঠায়েছ। তরুশিরে বিচিত্র বর্ণের আলিম্পন
  করিয়াছে উন্মন অধীর
  মৌনা, বাক্যহীনা, মূক বক্ষখানি স্তব্ধ বিটপীর
  তারো চেয়ে বিড়ম্বিতা হেথা এক বন্দিনীর আঁখি।' (সাঁঝের মায়া)

- 'বধুঁ মোর আজকে এলে
  আজি যে ভরা সুখে
  কেবলই পরাণ কাঁদে।' (বাসন্তী)

- 'কাল কভু চুপ নাহি রয়
  কথা কয় সে যে কথা কয়।' (কালের যাত্রার ধ্বনি)

- 'তুলি দুই হাত করি মোনাজাত
  হে রহিম রহমান
  কত সুন্দর করিয়া ধরণী
  মোদের করেছ দান।
  গাছে ফুল ফল
  নদীভরা জল ...
  সকলি তোমার দান।' (প্রার্থনা)

- ‘সবুজ পাতার খামের ভেতর
  হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে
  কোনপাথারের ওপার থেকে
  আনল ডেকে হেমন্তকে?
  আনল ডেকে মটরশুঁটি
  খেসারি আর কলাই ফুলে
  আনল ডেকে কুয়াশাকে
  সাঁঝ সকালে নদীর কূলে।’ (হেমন্ত)

- ‘হে কবি! নীরব কেন ফাল্গুন যে এসেছে ধরায়
  বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়? (তাহাকেই পড়ে মনে)

- ‘আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা
  তোমরা এযুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা।
  আমরা যখন আকাশের তলে ওড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি
  তোমরা এখন কালের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।’ (আজিকার শিশু)

- ‘মানব জীবন! শ্রেষ্ঠ কঠোর
  কর্মে সে মহীয়ান,
  সংগ্রামে আর সাহসে প্রজ্ঞা
  আলোকে দীপ্তিমান।
  পায়ের তলার মাটিতে, আকাশে,
  সমুখে সিন্ধু জলে
  বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ
  চলিয়াছে দলে দলে’। (সাম্য)

- ‘কত যে মাতার সন্তান আজো রহিয়াছে কারাগারে শোনো ফরিয়াদ মাথা
  কুটে বারে বারে
  পাষাণ প্রাচীর ভাঙ্গিতে পারেনি যারা
  ঈদের খুশি কি ঘরে আনিয়াছে তারা?’ (মিটাতে জঠর ক্ষুধা)

সুফিয়া কামাল শুধু সাহিত্য চর্চা-ই নয়, তার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজেও ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৩-১৯৪১ পর্যন্ত তিনি কলকাতা কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সেখানে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আবদুল কাদির ও কবি জসীমউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার

উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। তিনি কলকাতার বস্তি এলাকার মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। নারী জাতির উন্নতির জন্য তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বেগম রোকেয়ার 'আঞ্জুমান খাওয়াতিন'-এ যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৩ এ দুর্ভিক্ষের সময় বর্ধমানে এবং ১৯৪৬ এর direct action day-র হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পর বিপন্ন ও আহত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেবা করেছেন। ১৯৪৭ এ ঢাকাতে ওয়ারি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন, গণ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালে তাঁকে সভানেত্রী করে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'সুলতানা পত্রিকা'। তিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির জন্য আমরণ লড়াই করেছেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর দমনপীড়ন নীতির অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি অনেক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা-প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন-বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন কমিটি, দুঃস্থ পুনর্বাসন সংস্থা প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি ছায়ানট, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এবং নারী কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী ছিলেন।

বাঙালি নারীদের সার্বিক উন্নয়ন সুফিয়া কামাল আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন। তাঁর সমকালে নারীদের কিছুটা উন্নতি দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন: 'আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে এই দেখে যে, মেয়েরা আগের তুলনায় অনেক সাহসী হয়েছে। মেয়েরা এখন রাস্তায় বেরিয়ে অন্তত নিজেদের কথা বলতে শিখেছে। আমরা চেয়েছিলাম মেয়েরা কথা

'আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে এই দেখে যে, মেয়েরা আগের তুলনায় অনেক সাহসী হয়েছে। মেয়েরা এখন রাস্তায় বেরিয়ে অন্তত নিজেদের কথা বলতে শিখেছে। আমরা চেয়েছিলাম মেয়েরা কথা বলতে শিখুক, সাহসী হয়ে উঠুক, নিজেদের অধিকার তারা বুঝতে পারুক। এটা এখন হয়েছে। এটা বড় আনন্দের।'

বলতে শিখুক, সাহসী হয়ে উঠুক, নিজেদের অধিকার তারা বুঝতে পারুক। এটা এখন হয়েছে। এটা বড় আনন্দের।'

নারী সম্মানের সঙ্গে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করুক, নারী আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হোক, শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোক শিখাতে নারীর মানস মুক্তি ঘটুক, এই ছিল সুফিয়া কামালের আন্তরিক শুভকামনা। তবে নারী স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে তিনি নারীর স্বেচ্ছাচারিতাকে মোটেই সমর্থন করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'মেয়েরা স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু অনেকেই সেই স্বাধীনতার ব্যবহার সবসময় সঠিকভাবে করতে শেখেনি। অনেক সময় অপব্যবহার করেছে। এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগে।... মেয়েরা মডেলিং করুক, অভিনয় করুক, কিন্তু তা যেন মর্যাদা হারাবার মাধ্যম না হয়।'

সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও সচেতন নাগরিক হিসেবে সুফিয়া কামালের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর সমকালে শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজের একজন মহিলা হিসেবে তিনি বিস্ময়কর সক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন। মুসলমান সমাজের বেশিরভাগ নারীর মতো পর্দানসীনা না থেকে কঠোর অধ্যাবসায়, জেদ ও সাহসকে সম্বল করে সীমায়িত গণ্ডি পেরিয়ে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং দেশ ও দশের জন্য অজস্র হিতকর কাজ করেছেন। তাঁর এই নিষেধের বিশাল হার্ডল পেরিয়ে আসাটা শুধু গৌরবের নয়, আমি তো মনে করি এটা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের। এই চ্যালেঞ্জ আসলে ঘেরাটোপে আবদ্ধ নারীর মুক্তির উল্লাস অন্বেষণের পহেলা কদম। মানুষের কল্যাণ সাধনকেই তিনি মানবজন্মের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। তাই তাঁর সৃজনকর্মে ও সমাজকর্মে বিচ্ছুরিত হয়েছে মানবতার আলোকরেখা।

বী ক্ষ ণ

রোশেনারা খান

কেন আমরা পিছিয়ে

ইসলাম ধর্মে নারীকে যে সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম শিক্ষার অধিকার। এই অধিকার নারী পেয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে। নারীর জন্য এই অধিকার আদায় করার জন্য এদেশের সমাজ সংস্কারকদের কত না সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেটা খুব বেশিদিন আগে নয়, ১৫০ বা ২০০ বছর আগের ইতিহাস। খ্রিস্টান মিশনারিরা এদেশে যখন ধর্ম প্রচার শুরু করেন, তখন সাধারণ পরিবারের মহিলাদের মধ্যে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদি দেখে শিউরে ওঠেন। তখনই তাঁরা মহিলাদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করায় মন দেন। তবে এই স্কুলে অভিজাত পরিবারের মেয়েদের পাঠানো হত না। কারণ ওরা স্কুলে শিক্ষাদানের পরিবর্তে মেয়েদের ধর্মান্তরিত করবে এই সন্দেহে। ওইসব স্কুলে সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের গুটিকয় মেয়ে পড়তে যেত।

ধীরে ধীরে শিক্ষিত বাঙালি পুরুষদেরও চেতনা ফিরতে শুরু করে। তারাও ভাবতে শুরু করেন, মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁরাও মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ১৮২৩ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে মিশনারিদের পৃষ্ঠ পোষকতায় এই বাংলাতে ৩০টি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় প্যারিচরণ সরকার ও কালীকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে বারাসতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি বেথুন সাহেব বারাসত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে উপলব্ধি করেন, কলকাতায় মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা খুবই প্রয়োজন। না হলে কলকাতার মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে কীভাবে? ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব কলকাতার বুকে 'সেকুলার নেটিভ ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এই স্কুলকে দান করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয়। তৎকালীন সরকার ১৮৬৫ সালে এই স্কুলটির নাম রাখেন বেথুন স্কুল। এই ১৮৪৯ সালেই বিদ্যাসাগর তাঁর জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে মেয়েদের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মা ভগবতী দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন।

সেই সময় নারী শিক্ষায় উৎসাহ দাতা পুরুষ যেমন ছিলেন, তেমন বাধা সৃষ্টি করার পুরুষেরও অভাব ছিলনা। নীলকণ্ঠ মজুমদার নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি

তাঁর লেখায় বলেছেন, এই শিক্ষা নারীর পক্ষে অমঙ্গলকর। কেন না এর ফলে নারীর পুত্র সন্তান ধারণের শক্তিগুলি হ্রাস পাবে। শিক্ষিতা বিদুষী মহিলাদের বক্ষদেশ সমতল হয়ে যাবে, তাতে স্তনের সঞ্চার ঘটবে না। জরায়ুর বিকৃতি ঘটবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথা মানুষ কতখানি বিশ্বাস করত তা না জানা গেলেও মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে কেউই তেমন আগ্রহী ছিলেন না। 'মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শেখার দরকার কী? ওরা তো কলম পিষতে যাবে না। বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়লেই হবে'। বেশিরভাগ অভিভাবকদের মেয়েদের ক্ষেত্রে এই মানসিকতা কাজ করত।

পরিসংখ্যান অনুপাতে আমাদের রাজ্যে চিরকালই শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম মেয়েদের উপস্থিতি খুবই কম। এর প্রধান কারণ মুসলিম সমাজের অবরোধ প্রথা ও মেয়েদের প্রতি অবহেলা, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অযোগ্য ভাবা। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এই বিষয়ে লিখেছেন, 'আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন ইহাদের পর্দার ফজল সবচেয়ে বেশি। কন্যাকে পুত্রের মত শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ তাহা মনেও করিতে পারিনা। শুধু আবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। অশিক্ষার গভীরতার কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি'। আর এই কারণেই হিন্দু মেয়েরা শিক্ষা লাভের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে সামনে পা বাড়াতে সক্ষম হলেও মুসলিম মেয়েরা অবরোধের আড়ালে থেকে যায়, ফলে নারী প্রগতির মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। ইসলাম

'আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন ইহাদের পর্দার ফজল সবচেয়ে বেশি। কন্যাকে পুত্রের মত শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ তাহা মনেও করিতে পারিনা। শুধু আবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। অশিক্ষার গভীরতার কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি'।

নবাব ফয়জুন্নেসাকে বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক বলা যায়। তিনি স্বশিক্ষিতা ছিলেন। বাড়িতে টোল খুলেছিলেন সংস্কৃত শেখার জন্য। তিনি তাঁর 'নবাব' হওয়ার সমস্ত ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধাগুলিকে প্রজাদের, বিশেষ করে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজে লাগিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়ার মধ্যে যে আগুন ছিল তা থেকেই তিনি অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালাতে ব্রতী হয়েছিলেন।

নারীকে যে শিক্ষার অধিকার দিয়েছে তা আরবি পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।

বেগম রোকেয়ার জন্ম আনুমানিক ১৮৮০ সালে। তিনি অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও প্রকাশ্যে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু অনেক অভিজাত পরিবারে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে রেখে মেয়েদের শিক্ষা লাভের ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। শহিদ সোরাবর্দির মা লেডি খুজিস্তাবানু একাধারে লেখিকা, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও পরীক্ষক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৭২ সালে মেদিনীপুর শহরে। খুজিস্তাবানু প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ১৮৮৭ সালে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করেছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

নবাব ফয়জুন্নেসাকে বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক বলা যায়। তিনি স্বশিক্ষিতা ছিলেন। বাড়িতে টোল খুলেছিলেন সংস্কৃত শেখার জন্য। তিনি তাঁর 'নবাব' হওয়ার সমস্ত ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধাগুলিকে প্রজাদের, বিশেষ করে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজে লাগিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়ার মধ্যে যে আগুন ছিল তা থেকেই তিনি অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালাতে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁকে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়ে ছিলেন তাঁর উদারমনস্ক, শুভচিন্তক স্বামী সাখোয়াত হুসেন। স্বামীর প্রেরণাতেই বেগম রোকেয়া সাহিত্য রচনায় মন দিয়েছিলেন। আজ যা আমাদের কাছে ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ।

সেইসময় মুসলিম পরিবারের মেয়েদের অবরোধ প্রথার কারণে শিক্ষালাভের জন্য ঘরের বাইরে বের করে নিয়ে আসা বা নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না। পারিবারিক সমর্থন থাকলেও সমাজের সায় ছিল না। যে কারণে

মেয়েদের গৃহশিক্ষকই ভরসা ছিল, তাও একটা বয়স পর্যন্ত। বেগম রোকেয়া যাঁদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রতিভাময়ী শামসুন্নাহার, মেহেরুননেশা ইসলাম উদাহরণ স্বরূপ। এঁদের কথা বলা যেতেই পারে। শামসুন্নাহারকে বালিকা বয়সেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ গৃহশিক্ষক টেবিলের যে প্রান্তে বসতেন, তার অপর প্রান্তে বসতেন ছাত্রী শামসুন্নাহার। মাঝ বরাবর কাপড় টাঙানো থাকত, যাতে একে অপরকে দেখতে না পায়। কলেজে পড়ার জন্য তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে (তক্ষত) বসতে হয়েছিল। আসলে বিয়ের পর শামসুন্নাহারকে কলেজে পড়তে দেওয়া হবে, এই শর্ত মেনেই ডাক্তার ওয়াহিদউদ্দিন শামসুন্নাহারকে বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে বাংলার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

মেহেরুন্নেসার জন্ম ১৯২১ সালে। বাবা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মেয়েকে কিছুটা সাহস দেখিয়েই কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে ছিলেন (১৯৩০)। সেই সময়ের মোল্লাতান্ত্রিক সমাজ এটা মেনে নেয়নি। বলা হয়, খান সাহেব শরিয়তি বিধান লঙ্ঘন করেছেন, ওনার পিছনে নামাজ চলবে না। তবুও তিনি মেয়ের স্কুল বন্ধ করেননি। তিনি ওই মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে আদালতের মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন। তিনি ওই আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। এই ছোট্ট মেয়েটিকে বোরখা পরে বন্ধ ঘোড়ারগাড়িতে চড়ে স্কুলে যেতে হত। তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় বি.এ,বি.টি পাশ করে পূর্ববঙ্গে কোনো চাকরি না পেয়ে কলকাতা চলে আসেন। এখানে এসে কলকাতা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল মুসলিম গার্লস স্কুলে শিক্ষিকা ও হোস্টেল সুপার হিসেবে যোগ দিয়ে তাঁর বহুকাঙ্খিত স্বপ্ন পূরণ করেন। সেইসময় যে বাসগুলিতে ছাত্রীরা স্কুল যাওয়া আসা করত, তা কালো পর্দায় ঢাকা থাকত। ড্রাইভারের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল, মেয়েরা যেন পর্দা না সরায়। শুধু সমাজের বিরোধিতার কারণেই এই ব্যবস্থা। তা না হলে মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা সম্ভভ হত না।

তারপর গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে বহু স্রোত বয়ে গেছে। সেই স্রোতের জল কখনো ঘোলা, কখনো বা লাল। মুসলিম মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। কলেজ ইউনিভার্সিটিতেও ২/১ টি মুসলিম মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছে। কেউ পড়তে, কেউ বা পড়াতে গেছেন। কিন্তু সবাই যে আত্মনির্ভর করার জন্য মেয়েকে কলেজ ইউনিভার্সিটি পাঠাচ্ছেন, তা কিন্তু নয়। ভালো পাত্র পাওয়াটাই মূল লক্ষ্য। যদিও পাত্র কতটা ভাল, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবুও মেধাবী মেয়েকে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ না দিয়ে তাকে স্বামীনির্ভর করে তোলাতেই অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। তবুও মেয়েদের নিজের যোগ্যতা, অধিকার ও দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে তবেই আগামীর পথ চলা হবে অনায়াস।

মলয় মণ্ডল

সমুদ্র তীরের ভাষা ও বাংলা কথাসাহিত্য

সমুদ্রকেন্দ্রিক অধিকাংশ উপন্যাসের পরিসর খুবই স্বতন্ত্র। সমুদ্রতীরবর্তী মানুষের ভাষা আসলে একটি জনপদের ভাষা। সেই জনপদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান কারণ আঞ্চলিকভাবে মূল জনপদ থেকে বিচ্ছিন্নতা। এছাড়া সমুদ্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র এক পেশার জগত। সেই পেশা সমভূমির অন্য পেশার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সমুদ্র উপকূলীয় জনপদ ভারতবর্ষের মতো দেশে ব্যাপক ও বিচিত্র। দেশ ভেদে তার ভাষা ও সংস্কৃতি বদলে যায়। শুধু বাংলা ভাষার কথা যদি ধরি তাহলে দেখব দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ, নামখানা, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, গঙ্গাসাগর, জম্বুদ্বীপ, মৌসুনি এই অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এক বিশিষ্ট জনপদ। অন্যদিকে দিঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর, মন্দারমনি তথা পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও রচিত হয়েছে উপকূলীয় জনপদ। এই সমস্ত অঞ্চলের ভাষার মধ্যে আঞ্চলিকতার লক্ষণ স্পষ্ট। সমুদ্রের উপকূলবর্তী যে সমস্ত অঞ্চল রয়েছে তাদের ভাষা বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে। আঞ্চলিক অবস্থান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সমুদ্র-উপকূল অঞ্চল রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্গত। এই রাঢ়ী উপভাষার মধ্যে যে বৈচিত্র রয়েছে সেই আঞ্চলিক রূপগুলিকে গবেষক ড. বানেশ্বর দাস বলেছেন 'বিভাষা'

(Sub-Dailect)। রাঢ়ী উপভাষাকে তিনি যে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন তার মধ্যে একটি ভাগে রয়েছে দক্ষিণ-মধ্য, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাষা। অবশ্য এই স্থান বিভাজনে ভাষার রূপ যথাযথ প্রকাশিত হয় না। আমরা জানি অনেক অঞ্চলের ছোটো ছোটো ভাষা-পকেট থাকে। যেমন ধরা যাক, কাকদ্বীপ অঞ্চলের ভাষা এবং নদীর ওপারে সাগরদ্বীপের ভাষার মধ্যে অসংখ্য পার্থক্য দেখা যায়। আবার সাগরদ্বীপের অধিকাংশ মানুষ মেদিনীপুর থেকে এলেও দুটি অঞ্চলের ভাষায় রয়েছে বিভিন্ন উচ্চারণগত রূপান্তর।

আমরা পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলের প্রেক্ষাপটে রচিত অনিল ঘড়াই-এর 'সামনে সাগর' (২০০৩) ও সন্তোষ করের 'মুক্তামাছ' (১৯৯০) বই দুটির প্রেক্ষিতে ঐ অঞ্চলের কিছু ভাষা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরব। অনিল ঘড়াই-এর জন্ম পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা-য়। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে মেদিনীপুরের পটভূমি ব্যবহার করা হয়েছে। 'সামানে সাগর' গল্পের কথক প্রমিত বাংলা ভাষায় তাঁর কথকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে সেই বাচনের মধ্যে রয়ে গেছে মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষার ঐতিহ্য বহনকারী অনিল ঘড়াই স্বয়ং। আর সেজন্য মাঝে মধ্যে সেই ভাষা লেখকের বর্ণনায় প্রকাশিত হয়—'চামড়ার চারিদিকে খিলকাঠি গুঁজে পুকুরের এঁটেল মাটিতে রগড়ে হাত ধুয়ে নিল ভরত, ঘাড় ঘুরিয়ে বেলা আন্দাজ করে চমকে উঠল সে। বেলা চলে গেছে টেঁরের দিকে,...।' এখানে এই যে 'রগড়ে' বা 'টেঁর' এই শব্দগুলো বহন করছে সাহিত্যে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কিছু কাব্যিক ভাষা লক্ষণ এই উপন্যাসের দুর্বল একটি জায়গা। যেমন গঁড়া বুড়ো যখন বলে 'এ দেহ ছেড়ে পাখিটা যে কবে উড়ে যাবে জানি নে !... তবে মরতে আমি ভয় পাইনে,' 'জানি নে' এই নঞর্থক শব্দবন্ধ কি গঁড়া বুড়োর মুখে মানায়? প্রাণকে পাখির সঙ্গে তুলনা করার জন্য গঁড়া বুড়োর এই কাব্যিক উচ্চারণ! না কি এটা নিছক লেখকের সংস্কার? গঁড়া বুড়োর ভাইপো যে শরীরকে 'শরীল' বলে তাকেও বলতে শুনি 'কি করব, আমি যে আর কিছু করে উঠতে পারছি নে। যেদিকেই যাই শুকনো সাগর।'

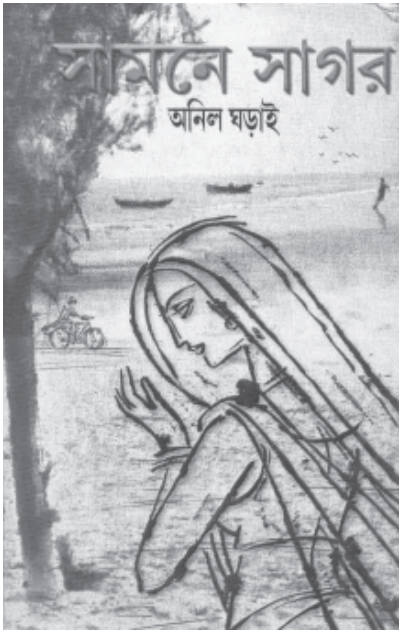

এখানেও 'শুকনো সাগর' এ কাব্যিক দ্যোতনা থাকায় এই রাবীন্দ্রিক নঞর্থক ধ্বনি প্রয়োগ বলে মনে হয়। আসলে মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলের যে বাচনপ্রক্রিয়া তা কলকাতার প্রমিত ভাষার পাঠকদের কাছে খটোমটো অনভ্যাসের মতো। সেই ভাষা যদি প্রয়োগ করতে হয় তাহলে বৃহত্তর বাংলা পাঠকের কাছে পৌঁছান যায় না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাঢ় অঞ্চলের কথা লিখেছেন তাঁর মনেও সেখানকার ভাষা প্রয়োগ নিয়ে দ্বিধা ছিল।

একটি ভাষা অঞ্চলের কিছু বিশিষ্ট শব্দভাণ্ডার গড়ে ওঠে, সেই অঞ্চলের মানুষরা সেই শব্দভাণ্ডারকে সঙ্গী করেই বড়ো হয়। দীঘা কাঁথি অঞ্চলেরও কিছু বিশিষ্ট শব্দভাণ্ডার রয়েছে। যেমন : মুড়িভুজা—ফুলকা, উঠোন—বাহার, কুমড়ো—বৈতাল, ল্যাটা মাছ—গড়ি মাছ, বেলে মাছ—ভাতুয়া মাছ। এই উপন্যাসেও তেমন কিছু শব্দের আঞ্চলিক রূপ আমরা দেখেছি। কিন্তু সে বিষয়েও কি দ্বিধা ছিল লেখকের? যেমন সমুদ্রের কচ্ছপ বা লেখকের কথায় 'সমুদ্রকাছিম'-এর আঞ্চলিক উচ্চারণটি লিখতে গিয়ে বলেছেন 'কে যে সমুদ্র কাছিমের নাম রেখেছিল বালিগড় নকুল তা জানে না।' আবার এর পাশে নদীর কচ্ছপের প্রসঙ্গে তাঁর বয়ান স্বাভাবিক 'নদীর কচ্ছপের নাম কাঁসারী'। এই উপন্যাসে কিছু ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ছিল, যেমন সুদামের মায়ের কথা 'অমনধারা কাঁদতে নেই, কাঁদবি কেনে'। 'কেন' এই প্রশ্নবোধক অব্যয়ের আঞ্চলিক রূপ 'কেনি' বা 'কেনে'। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রে এমন আঞ্চলিকতাকে প্রকাশ করেছেন লেখক।

আসলে আমরা জানি, দীঘা হল একটি পর্যটন কেন্দ্র। সেখানে প্রচুর বাইরে থেকে পর্যটক আসেন। এই সব পর্যটক প্রমিত বাংলায় কথা বলেন বেশির ভাগ সময়। সেজন্য

আসলে আমরা জানি, দীঘা হল একটি পর্যটন কেন্দ্র। সেখানে প্রচুর বাইরে থেকে পর্যটক আসেন। এই সব পর্যটক প্রমিত বাংলায় কথা বলেন বেশির ভাগ সময়। সেজন্য দীঘার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে দ্বিবাচনিকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন বাইরের মানুষের সঙ্গে প্রমিত বাংলা, আর নিজেদের এলাকার মানুষদের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা। লেখক অনিল ঘড়াই এখানে দ্বিবাচনিকতার তত্ত্ব মেনে প্রমিত বাংলাকে বেছে নিয়েছেন।

দীঘার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে দ্বিবাচনিকতা লক্ষ করা যায়। যেমন বাইরের মানুষের সঙ্গে প্রমিত বাংলা, আর নিজেদের এলাকার মানুষদের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা। লেখক অনিল ঘড়াই এখানে দ্বিবাচনিকতার তত্ত্ব মেনে প্রমিত বাংলাকে বেছে নিয়েছেন।

'মুক্তামাছ' উপন্যাসের লেখক সন্তোষ কর দীঘার ভূমিপুত্র। দীঘার কাছে ক্ষীরপাল গ্রামে তাঁর জন্ম। 'মুক্তামাছ'-এর প্রেক্ষাপটও দীঘার নিকটবর্তী শংকরপুর এলাকা। এই উপন্যাসে বাখতিন কথিত বহুস্বরের মিশ্রণ আছে। লেখক এখানে প্রমিত ভাষা নিয়ে কথকের ভূমিকা নিলেও এই উপন্যাসের চরিত্রেরা সমুদ্র তীরবর্তী আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। যেমন উপন্যাসের নায়ক সুবল আর ফুলির কথোপকথন—'হাসচু যে?/লায়ের উপর এমনে শুইতে নাই কেনে গো?.../প্রশ্ন শুনে কৌতুকী হাসলো সুবল। বলল, জানুনি তু?/ কাঁই না তো?' হুঁ, পুরুষ মানুষ কার উপর শোয়, ক দেখি ক?/আমি কইতে পারবনি যাও।/বলেই অন্যদিকে মুখ ঘোরালো ফুলি।' আঞ্চলিক হলেও এই ভাষা বুঝতে যে কোনো প্রমিত ভাষার মানুষের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

'মুক্তামাছ' উপন্যাসে মেদিনীপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি ভদ্রজনের প্রমিত বাংলার উদাহরণ রেখেছেন লেখক। উপন্যাসের নায়ক সুবলের বাপ হারাধন মাঝি কাজ করে কলকাতার বাবুদের নৌকো 'মা সুরেশ্বরী'তে। সুবল কৈশোর বয়সে যখন বাপের সঙ্গে মামার বাড়ি যাচ্ছিল কাকদ্বীপে, তখন সে প্রথমবার নৌকায় ওঠে। যখন সে নৌকায় বসে নৌকার চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করছিল তখন একটি লোক চেঁচিয়ে বলে 'এ্যয় ছোকরা, কি করছো ওখানে। এদিকে এসো।' লেখক এরপর লিখেছেন 'পরিষ্কার বাংলা শুনে ভড়কে যায় সুবল। বাপের সাথে একবার হাটে গেছিল। সেখানে গিয়ে তার এই ধারণা হয়েছে, ভদ্র ভদ্র লোকেরা যাদের অনেক পয়সা আছে, তারা বলে বাংলা কথা। কিন্তু এখানে...লোকটার দাড়ি তার বাপের দাড়ির চাইতে লম্বা। দেখলে ভয় করে। তার ওপর বাংলা কথা! ভয়ে ভয়ে ছইয়ের দিকে সরে আসে সুবল।' সুবলের চিন্তার ভেতর দিয়ে আঞ্চলিক ভাষাগুলির উপরে প্রমিত বাংলা ভাষার যে আধিপত্যবাদী মনোভাব তা যেন এখানে কৌশলে বলতে চেয়েছেন লেখক।

লৌকিক ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচনও এই উপন্যাসে রয়েছে। যেমন কেতু বউ সুবল কে বলেছে, 'পেটে নাই ভাত, মুখে জগত মাত'। নৃপতি সুবলকে শোনায়, 'রাঁড়ির টাকায় বাড়ি হাঁকায়, সাত মুল্লুক মারে'। কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দবন্ধ রয়েছে;যেমন 'ভুখ-ধোঁকা মাস, ভুঁই বেঁধা চোখ', ছয়ালি বিরাম', ধস্‌রা বালি' ইত্যাদি। এর পাশাপাশি জেলে জীবনের নানান শব্দ উপাদান; যেমন—খেই জাল, ছানি জাল, সাবাড় ভেটি, সাবাড় জাল, ধাই জাল।

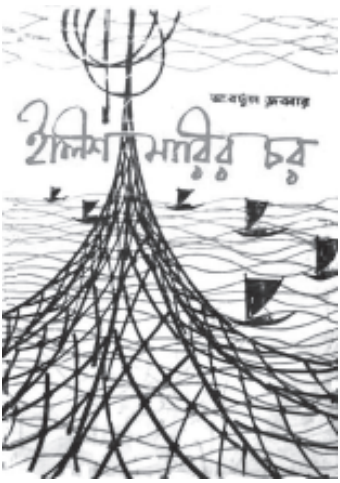

আব্দুল জব্বারের 'ইলিশ মারির চর' সমুদ্রতীরের আখ্যান নয়। এই উপন্যাসের পটভূমি কোনো সমুদ্রের কাছাকাছি এক নদীর চরা। এবং একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানকার জেলেরা নদীতে ইলিশ মাছ ধরে। কিন্তু ইলিশের আকাল দেখা দিলে তারা সমুদ্রে যায়। কিছু কিছু স্থান রয়েছে যেমন-গদাখালি, বাখড়ার হাট। এই সব নামের প্রেক্ষিতে বোঝা যায় উপন্যাসটি হুগলী নদী তীরবর্তী বজবজ, নোদাখালি অঞ্চলের উপন্যাস। লেখক নিজেই ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা। সুতরাং এই উপন্যাসে যে ভাষা রয়েছে তার মধ্যে ঐ অঞ্চলের ভাষা-বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাবো। একটু উদাহরণ নেওয়া যাক—

> "একটা পাজারী মেয়ে বলে, "মিনষে যে কথাই কয়নে রে! বলি কত্‌কে হবেকত্‌কে হলে মন উঠ্‌বে?
> জয়নুদ্দি বলে, "তিন টাকা সের, লেবে ?
> পঞ্চাশ টাকা কুড়ি দাও তো লিই, সের দরে পারবো নিকো।
> সেদিন আর নেই লো বুবু! সেদিন গয়ায় গ্যাচে। ত্যাখন লোকে বলতো 'দাঁড়ি মাঝির পরনে ট্যানা, আর পাজারী মাগীর কানে সোনা!' একটা মাছে তুমি আড়াই টাকা লেবে আর বেচবে কত্‌কে? এক সের পাঁচ-পো'র কম তো মাছ নেই।"

একদিকে নারীর ভাষার মধ্যে আছে 'নিকো', 'কতকে' প্রভৃতি বিশিষ্ট ধ্বনি সংযুক্তি, অন্যদিকে 'এ' ধ্বনিগুলিকে 'অ্যা' হিসেবে উচ্চারণ করার প্রবণতা। 'ন'কে উচ্চারণ ত্রুটির কারণে 'ল' হিসেবে উচ্চারণের প্রবণতা এই উপন্যাসে বহুবার দেখা গেছে। পাশাপাশি রয়েছে আঞ্চলিক প্রবাদ প্রবচন এর নিদর্শন। যেমন, 'হাঁকাই ছেড়ে খাকাই দর', 'দাঁড়ি মাঝির পরনে ট্যানা, আর পাজারী মাগীর কানে সোনা!' দিন কতেকের লবর চবর দাঁড়ি মাঝির কড়ি', 'ভূতের মুখে লা ইলাহা' ইত্যাদি। কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দও রয়েছে এই উপন্যাসে, যা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক স্তরে ব্যবহৃত হয়। যেমন : পুইয়ে যাওয়া—শেষ হওয়া, ঝুজকো—ভোর, ভাত খসানো—ভাত বাড়া, মাগুরে রঙ—শ্যামলা, জেয়ল—কচ্ছপ, মেতা—কুচো চিংড়ি, বাম—দুহাত প্রসারিত পরিমাণ মাপ, বাঁটা—পার করা, খোরে—নীচে।

সমস্ত উপন্যাসেই যে এই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এমন নয়। লেখকের বর্ণনা কিংবা যেখানে শিক্ষিত মানুষের ভাষা ব্যক্ত হয়েছে তা পুরোপুরি কিন্তু প্রমিত বাংলা ভাষা। যেমন, প্রদীপ আনোয়ার যখন নিজের পরিচয় দেয়, বলে 'আমার বাবা মুসলমান, মা হিন্দু। অতএব আমাকে বলতে পারেন দুই-ই।...আমি মাতৃপরিচয়কে অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করতে চাইনে।'

কাকদ্বীপ, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগরদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা দক্ষিণবঙ্গের এই বিস্তৃত সমুদ্র উপকূল জুড়েও বাংলা ভাষার এক বিশিষ্ট আঞ্চলিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। সাগরের বিশিষ্ট এই ভাষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে গবেষক শুভেন্দু জানা লিখেছেন— 'মেদিনীপুরের ভাষা কখনো চোরা স্রোতে কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে এই মানুষগুলোর সাথী করে দ্বীপটিতে জুড়ে বসেছে। তবে দ্বীপটির আত্মমর্যাদাও প্রবল। ভাষাটিকে সে নিজের রসে জারিত করেছে অনেকটা। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে উড়িষ্যা। ফলে মেদিনীপুরের কাঁথি সংলগ্ন অঞ্চলগুলির মতো এখানেও রাঢ়ির সঙ্গে ওড়িয়া মিশ্রিত হয়ে এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এ ভাষার কিছু শান্তিপুরী, কিছু ওড়িয়া রূপ বর্তমান। যেমন—

১. 'আমি খেয়ে চলে যাবো (রাঢ়ি)/মু খাইকি পলাইবু/ চলি যিবু(ওড়িয়া)

আমি খাইকি চলি যাবা/আমি খ্যায়া চলি যাব। (সাগরদ্বীপ)।'

তবে শুধু সাগরদ্বীপ নয় দক্ষিণের সমুদ্র তীরবর্তী অধিকাংশ জনপদেই এই ওড়িয়া ও রাঢ়ি ভাষার মিশ্রিত যে ভাষারূপ তা প্রচলিত আছে বলেই মনে হয়। কিছু ক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গের প্রচলিত শব্দভাণ্ডারও এর সঙ্গে জুড়ে থাকে। ফলে প্রমিতভাষী বাঙালির

সমস্ত উপন্যাসেই যে এই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এমন নয়। লেখকের বর্ণনা কিংবা যেখানে শিক্ষিত মানুষের ভাষা ব্যক্ত হয়েছে তা পুরোপুরি কিন্তু প্রমিত বাংলা ভাষা। যেমন, প্রদীপ আনোয়ার যখন নিজের পরিচয় দেয়, বলে 'আমার বাবা মুসলমান, মা হিন্দু। অতএব আমাকে বলতে পারেন দুই-ই।...আমি মাতৃপরিচয়কে অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করতে চাইনে।'

কাছে তা আধা চেনা আধা অচেনা মনে হতে পারে। সাহিত্যে এই ভাষার প্রকাশ কীভাবে ঘটেছে এবার তার পরিচয় নেওয়া যাক।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র দুয়ার' (২০১০) উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্র রয়েছে, এর মধ্যে ধর্ম বা জাতিগত পরিচয়ে ভাষার পার্থক্য তৈরি হয়নি। ভাষার পার্থক্য তৈরি হয়েছে অবস্থানগত ভিন্নতায়। ফ্রেজারগঞ্জের স্থানীয় মানুষদের মুখের ভাষায় আঞ্চলিক টান অল্প হলেও দেখা গেছে, কিন্তু শিক্ষিত জীবনবাবু বা কলকাতার মানুষজনের কথাবার্তা যেখানে এসেছে সেখানে কিন্তু লেখক তাঁর নিজস্ব প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন। যথা—'শিশির মাণ্ডি দু-চার পা জোরে ফেলে, ও হাতুম কাঁই যাও?/আমাদের মজাগাঙ দেখতে/কে নি গো?/আজ জুয়োরের তিথি। যদি হাটের গাঙ, সমুদ্দুরের বন্যা টেনে আনে? আগাম সাবধান হবো নি...'।

যদিও এটা সত্য, যে আঞ্চলিক ভাষার হুবহু ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে কোনো একটি সাহিত্যের পাঠপ্রতিক্রিয়ায় অনেক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। সেজন্য লেখক এখানে কিছু কিছু শব্দে কেবল আঞ্চলিক উপভাষার স্পর্শ রেখেছেন মাত্র। শচীন দাশের 'নুন দরিয়া' (২০১১) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট প্রায় একই জায়গা। তিনিও ভাষার ক্ষেত্রে এই মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়েছেন। যেমন—'গণপতি বলে, জঙ্গলের কাঠ লিয়ে যদি একটা নৌকা বানিয়ে নেয়্যা যায়। নৌকা! নৌকা দিয়ে হব্যা কী? নিবারণ অবাক!/কিনো? নৌকা লিয়া গেঁওখালি যাবু।/এ-কথায় নিবারণ চমকায়। বলে, না না ইমন মতিগতি করত্যা হব্যানি। ধরা পড়লি সাহেব মানুষেরা মেরা্যা ফেলতা পারে।'

সাগরদ্বীপের ভূমিপুত্র সাহিত্যিক বিভু নাগেশ্বর তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মায়া গোয়ালিনির ঘাট' (১৯৯৬)-এ সাগরদ্বীপের ভাষা ব্যবহার করলেও তাঁর অন্য উপন্যাসগুলিতে কিন্তু তিনি মধ্যপন্থা নিয়েছেন। 'মায়া গোয়ালিনীর ঘাট' উপন্যাসের কথক সীতাপতির মুখের ভাষা এরকম—'এই এ জেগিয়াটার নাম কেনি হইল? এ লাটটা প্রথম কে ধরথল? প্রথম প্রথম এ জমিয়াগুলা কী রকম থাইল?' সীতাপতির মুখের ভাষাই হল সাগরদ্বীপের নিখাদ ভাষা, যার মধ্যে ওড়িয়া ও রাঢ়ির মিশ্রণ ঘটেছে। এই ভাষা পাঠকের কাছে বিরক্তির কারণ কিনা সে বিষয়ে জানতে হলে এই উপন্যাসের ভূমিকা লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়-এর বয়ান নেওয়া যায়—'তরতর করে পড়ে ফেলেছি। লেখার এত টান। আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথন সামান্য অস্বস্তির কারণ হলেও, পরে সহজ হয়ে গেছে।'

অমর মিত্রের 'ধনপতির চর'(২০১০) উপন্যাসটিও বঙ্গোপসাগরের মোহনার কাছে যে অজস্র চর গজিয়ে উঠেছে তেমনই একটি চরের গল্প। চরের আকৃতি কাছিমের পিঠের মতো হওয়ার ফলে কাছিমের টোটেম এই উপন্যাসের সমস্ত কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলা যায়। অবশ্য ধনপতির চর কি আদৌ আছে বাস্তবে? সমালোচকের

মতে—'পদ্মানদীর মাঝিতে হোসেন মিঞার যে-ময়নাদ্বীপ শুধুমাত্র ইশারায় উপস্থিত, অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' তারই যৌক্তিক ও শৈল্পিক সম্প্রসারণ?'

আমরা জানি, যে কোনো উপন্যাসের প্রেক্ষাপট অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ ধরে খুঁজতে গেলে তা অনেকসময় হতাশার কারণ হতে পারে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটের থাকে অর্ধসত্য বাস্তবতা। তাই ধনপতির চরের অস্তিত্ব ভূগোলের ম্যাপে না থাকলেও সাহিত্যের ম্যাপে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই উপন্যাসের ভাষায় রয়েছে কাব্যিক এক চলন। এই কাব্যিক পয়ার ভঙ্গিমার চলন বা বাক্য নির্মাণ বা বাক্যের বিকল্প হিসেব কবিতার প্রয়োগ শুধুমাত্র এই চরের অস্থায়ী বাসিন্দাদের ভাষায় উপস্থিত। বিশেষত মেয়েদের ভাষায়। এই দ্বীপ তো আসলে ছয় মাসের ভালো লাগা আর ভালবাসার দ্বীপ। তাই যেন ঘোড়াদল নামক মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের থেকে এই ভাষার আলাদা একটা চলন দেখালেন লেখক। এমনি একটি দ্বীপ, আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে যার অবস্থিতি, সেই মার্থাজ ভিনিয়ার্ডের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ভাষা গবেষক লেবোভ (১৯৬৬)। সেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে দ্বীপবাসীর উচ্চারিত /ন/ মূল ভূখণ্ডের /ন/ উচ্চারণের থেকে আলাদ হয়ে গিয়েছে। লেবোভের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, দ্বীপের অধিবাসীরা সচেতনভাবে নিজেদের ভাষাকে মূল ভূখণ্ডের ভাষার থেকে আলাদা করতে চাইছে। ধনপতির চরের মেয়েদের জীবনে ঘোড়াদলের যে যাপনপর্ব তা ছিল দুঃখময়। অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটে। কিন্তু মাছ ধরার মরসুমে ছ' মাস তারা ধনপতির চরে আসা জেলেদের অস্থায়ী কুটিরে অস্থায়ী বউ হিসেবে দিন কাটায়। আর এই স্বপ্নের দিনগুলোর ভাষাও যেন তারা ভুলে যায় :' ছ'মাস চরে, ছ'মাস ঘোরে, ওরে দেখে কী হয় কী হয়!/ওফ্ মেয়েমানুষ বটে তুই, তুর গানে কাছিম সদ্দার ঘুমাবে?.../যমুনা মাথা নাড়ে, কাছিম ধনপতির তো ঘুম ভাঙবেনি বাতাসি।/তাহলে বাকি সবাইকে দাও, তুমার মরদ কই? /ছিল তো, আরো বাবউ এয়েচে বুধ'য় ঘোড়াদল থিকে, তার সাথে জুটে নিশ কচ্ছে। তারা গান শুনল নি পয্যন্ত।/বাতাসি মনে মনে বলে, না শুনেছে না শুনেছে... কাত্তিক পুন্নিমে নিশি, মহাজাগরণ/ধনপতি কেনে এল ভীষণ নয়ন।'

চরের এই বিশিষ্ট উচ্চারণ রীতির মধ্যে লোকছড়া ও মৌখিক গদ্য যেন একাকার হয়ে যায়। এমনকি শব্দ উচ্চারণেও আছে একধরণের কোমলতা। টায়েম<টাইম, তাঁবে

<তাঁবেদারিতে, গরমেন<গভর্নমেন্ট, দেছে<দিয়েছে, তোরে<তোমাকে, ইনকুমারি< এনকোয়ারি ইত্যাদি। ধনেশ্বরী কুন্তি আর ঘোড়াদলের বিডিও অনিকেত সেনের কথোপকথনে কথার বিকল্প হিসেবে তাই পয়ার ছন্দে বারবার সংলাপ রচিত হয়েছে। এই উপন্যাসের পুরুষেরা সবাই গদ্যে কথা বলেছে, কিন্তু মেয়েদের মুখের কথায় বারেবারে এসেছে পয়ারের বিশিষ্টতা। যেমন—'কুন্তি অবাক, বলে, কত্তা তুমার মাথার ঠিক নাই।/আছে, মেয়েছেলে শাসনে রাখলি তারে দিয়ে সব কাজ করানো যায়। বলে ধনপতি

বিছানায় চিত হয়। কুন্তি ঘুমন্ত ধনপতির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর অভ্যাসে গুনগুন করে ওঠে/ধনপতি ধনপতি জগতের পভু/চড়ে আসা চড়ে যাওয়া না হয় কভু।'

সাগরদ্বীপের জেলেদের ভাষার মধ্যে গবেষক শুভেন্দু জানা লেভবের মতো বিশিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট খুঁজে পেয়েছেন। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখছেন—'জাল বা ট্রলার মালিকরাও জানে জেলেদের কাছে তাদের মর্যাদাটি। সেই মতো তারাও জেলেদীর সঙ্গে কথা বলে। একটু আধটু ব্যতিক্রম ছাড়া এই কথায় বিশেষ শ্রদ্ধা বা আন্তরিকতা নেই। ফলে এদের স্বরন্যাসে ঘৃষ্ট, মহাপ্রাণ ধ্বনির দেখা মেলে বেশি। জেলেদের স্বরন্যাসে থাকে অনুনয়ের বাকভঙ্গি।'

আসলে মানুষের মতো ভাষাও চিরকাল দুর্বলের উপর আধিপত্য কায়েম করতে চেয়েছে। যা প্রবল তা সব সময় দুর্বলকে ছোটো করে দেখতে চায়। সমুদ্রের তীরের জেলে বা অধিবাসীদের ভাষা শুনে আমরাও প্রমিত ভাষার মানুষেরা হাসাহাসি করি, বিদ্রূপ করি। ফলে সাগর বা পাথরপ্রতিমা বা দীঘার মানুষেরা নিজেদের কৌম ছাড়া তাদের ভাষার প্রকাশ করে না। এইভাবে তৈরি হয় দ্বিবাচন। আর লজ্জায় মুখ ঢাকতে ঢাকতে নতুন প্রজন্ম তার মাতৃভাষা হারিয়ে ফেলে। একটি প্রবল প্রমিত ভাষা জায়গা নিয়ে নেয় সেই সব বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে। সাগরদ্বীপের লেখক বিভু নাগেশ্বর জীবনের প্রথম উপন্যাস ছাড়া আর কোথাও সাগরের ভাষা প্রয়োগ করতে সাহস পাননি। দীঘার লেখক সন্তোষ করের পরবর্তী রচনাতেও সেই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। আর অনিল ঘড়াই তো প্রথম থেকে সচেতনভাবে আঞ্চলিকভাষাকে দূরে সরিয়ে রাখেন। আর এইভাবে একটি ভাষা প্রবলতর ভাষার কাছে পরাজিত হয়। ঠিক যেভাবে বাংলা ভাষা স্বয়ং হিন্দি ভাষার কাছে পরাজিত হচ্ছে রোজ রোজ।

অনুবাদ : মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম

'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম' বিশ্বসাহিত্যের ধারায় অবিস্মরণীয় সংযোজন। বিগত হাজার বছর ধরে এ রচনা কাব্যপিপাসু মনকে সিঞ্চিত করে আসছে। কাব্যটি অনূদিত হয়েছে প্রায় প্রত্যেক ভাষায়। আমাদের বাংলা ভাষাতেও এর অনুবাদ কম হয়নি। তারপরেও আমরা বর্তমান অনুবাদ প্রকাশ করলাম। আসলে আমরা বিশ্বাস করি, 'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম' এমন একটি সৃষ্টি যার স্পর্শে আরও একজন কবির জন্ম হতে পারে; নবরূপে ভাস্বর হতে পারেন বহমান কোনো কবি-মন; আমরা যার একান্ত প্রত্যাশী।

রুবাই-০১
জাগো প্রিয়ে! পেয়ালা ভরো, আনো, দেখো, রবির কর।
প্রাসাদ-' পরে, ছড়িয়ে পড়ে, তীরের ফলা, বাড়ায় কর।।
নভের পেয়ালা, ছাপিয়ে ওই, কিরণ-সুধা ঢালছে দেখ—
ফুলকলি সব উঠছে হেসে উপচে দেখ পড়ছে অধর।।

রুবাই-০২
প্রভাত হতেই শরাবখানায় গুঞ্জরিল মধুর ধ্বনি।
মধুশালায় হেসে হেসে বলল যেন কেউ তখনি।।
'থাকতে সময় পাত্র ভরো পান করে নাও সময় কম—
থাকতে আয়ু পান করে নাও যাবার আগে জীবনখানি।।'

রুবাই -৩
এবং কানে ভেসে এলো নাও পেয়ালা আর দু'চার।
বলছিল কেউ উচ্চ স্বরে, 'শরাবখানার খোলোদুয়ার।।
বড় ক্ষণিকের এই জীবনে বিলম্ব আর করো কিসের—
জীবন-প্রদীপ নিভে গেলে জ্বলবে না আর পুনর্বার।।'

রুবাই-০৪

বসন্ত ফের এলো ফিরে, মনে পুনঃ জাগল আশ।।
ব্যথিত হিয়া বলল চলো কোথাও করি একান্ত বাস।।
তরুলতা-ফুলফল আর আছে যেমন মুসার হাত—
সুগন্ধিত বনমালিকায় ওঠে যেমন ঈসার শ্বাস।।

রুবাই-০৫

দেখো আজি ফুল ফুটেছে লাখো মধুপ উঠল গেয়ে।
কিন্তু বলো, এ বন হতে ধন্য হবে মধু পেয়ে!!
টপটপিয়ে হয় নিঃশেষ, জীবন-পাত্র, খৈয়াম—
জীবন-পত্র পড়ছে পেকে জীবন-আয়ু যাচ্ছে ক্ষয়ে।।

রুবাই-০৬

কায়কোবাদ, কায়খসরু, দারা, রুস্তম, আরো সিকান্দারও বীর।
কে জানে আজ কোথায় তারা বড় বড় এই যোদ্ধা বীর!!
কিন্তু আজো কীর্তিগাথায় জাগে মাণিক্যের জ্যোতি—
এবং আজও চঞ্চলিত বনবনানীর স্নিগ্ধ সমীর।।

রুবাই-০৭

থোকা থোকা আঙুর থেকে নিংড়ে নিয়ে পেয়ালা ভরো।
গোলাপ-রঙিন ফুলেল নেশায় আমায় তুমি মত্ত করো।।
আধফোটা ওই ফুলের কলি মদ-লালিমায় রঙিন করে—
'পিতে থাকো, পিতে থাকো' বুলবুলি সেই বার্তা শোনায়।।

রুবাই-০৮

আনো সাকী, আনো সাকী! শরাব ঢালো, ফের পেয়ালায়।
গূঢ়-জ্ঞানের বাক্য-গাথা, ব্রত-বিবেক দাও চুলায়।।
শেখাতে থাকো ত্যাগের পট্টি, কেমন জ্ঞানী বন্ধু তুমি—
বোঝোনাকো এ বসন্তে হায় মধুকাল ব্যর্থ যায়!!

রুবাই-০৯
এ কথা তো আমিও ভাবি বলব আমি শপথ করে।
মদের মোহ ত্যাজব আমি, করব না পান জীবন ভরে।।
কিন্তু আজ তো প্রিয়া আমার আসল সেজে ফুলের সাজ--
আজ বসন্ত, প্রিয়তম! শান্তি করো জীবন ভরে।।

রুবাই-১০
আজ বসন্ত প্রিয়তম! পূর্ণ আজি এ রসরাজ।
জীবনপাত্র ভরব সবি ত্যাজব সকল লোক ও লাজ।।
প্রথম পেয়ালা পিয়ে নেবো, বার্ধক্য উড়িয়ে দেবো—
পর পেয়ালায় করব বরণ বরুণ-কন্যা ফের গো আজ।।

রুবাই-১১
নিত্য হেথা রবে নাকো এই জীবনের ডেরা কিছু।
প্রাণ-পাখি সে যাবে উড়ে করে রবে না যে আর কিছু।।
হেথায় শুয়ে বসে থাকো, করো শুধু 'তোমার, আমার'--
জীবন-স্বপন ভাঙবে যখন দেখবে তখন নেইকো কিছু।।

রুবাই-১২
আমিই যখন র'ব না তো, কিসের বল্খ-বুখারা, বাগদাদ?
পেয়ালা যখন নড়েই গেল, কিসের তেতো, মিঠার স্বাদ??
খাও, পিও, মৌজ করো, দিন দুয়েকের জীবনে খেয়াম—
ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ? পাপ-পুণ্য, কী বুনিয়াদ??

রুবাই-১৩
এসো প্রিয়ে! আমরা দুজন,পাপ-পুণ্যের, চর্চা ভুলে।
যাই দু'জনে সেই নিরালায় ঝঞ্ঝাটেরই নাতা ভুলে।।
রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, যেখানে কেউ, পুছবে না—
এবং তৃণ আসনকে সেই স্বর্ণাসনে নেবো তুলে।।

রুবাই-১৪

পেয়ালা ভরা মদিরা কিছু খাদ্য কিছু মনের মতো।
রইবে সাথে প্রেমের কাব্য প্রাণ জুড়ানো হবে সে তো।।
বসবে কাছে প্রিয়া তুমি তুলবে বীণায় মঞ্জুসুর—
কোথায় খুঁজি স্বর্গ প্রিয়া, হবে কী-তা এরই মতো??

রুবাই-১৫

স্বর্গলোকে সুখ খোঁজে কেউ বলে তারা তুলনাহীনা।
রাজপাটে কেউ সুখ খোঁজে আর তাতেই খোঁজে সুখবাসনা।।
ওরে মূর্খ নগদ কিছু থাকতে থাকতে সময় আদায় করো—
মরীচিকার পিছে ছুটে কোনো কিছু কেউ পাবে না।।

রুবাই-১৬

নগদ পাওনা নে রে বুঝে 'পরে'-র আশা যা রে ভুলে।
শুনে নে রে মূর্খ নাদান, বলছে হেসে গুলাব ফুলে।।
'যে সু-বর্ণ আনি আমি চলার আগেই বন্ধু আমার—
বনেই আমি ঝরে পড়ি তিলে তিলে ঝাড়ে-মূলে।।

রুবাই-১৭

সকল আশা এই মাটিতে মিশে আমার যায় যে হায়!
কখনো বা সাধ মেটে তো দু'দিন পরে ব্যর্থ যায়।।
হীরা-মোতী-সোনা-দানা-ধনসম্পদ যত আছে—
মরুদ্যানের ক্ষণিক সে সুখ যায় হারিয়ে মরীচিকায়।।

রুবাই-১৮

এবং, মরুস্থলের এই জীবনে সতর্কতায় লওগো কাম।
কালের চক্র ঘুরতে থাকে জীবন ঘিরে অষ্ট যাম।।
অবোধ ও মন সুখ-পিয়াসা মেটাতে তুই সামলে রাখিস—
স্বর্গ-নরকের মৃগ-তিষায় যেও না বয়ে ও খৈয়াম।।

রুবাই-১৯
স্বর্গ? স্বর্গ সে তো সৎ-কর্মের ক্ষণিক সুখের কর্মফল।
এবং, নরক সে তো ব্যর্থতারই কষ্ট-দুখের অশ্রুজল।।
পাপী-পুজারী, ধনী-দীনহীন, মূর্খ সে আর জ্ঞানী হায়—
সবাইকে তো দেখে নিলাম অন্তে সে তো একই ফল।।

রুবাই-২০
সেই যে কাঙাল যার জীবনে জোটেনি দানাও একটি সের।
রাজা, যে জন করেনি খরচ থাকতে তাহার খাজানা ঢের।।
দু'জনেরই মিলল 'মাটি' থাকতে সোনা-দানা হায়—
মাটির নিচে রেখে পুঁতে খুঁড়ে দেখ তাইই ফের।।

রুবাই-২১
ভাঙা-চোরা এ সরাইখানায়, যারে বলে এ সংসার।
জন্ম-মৃত্যু, এ দুয়েরই, আসা-যাওয়ার, এ দুই দ্বার।।
ঠাট-বাট আর অট্টালিকার আভিজাত্যে কাটাল দিন কিন্তু হায়—
নাটের খেলায় সুখ মিটিয়ে কাটিয়ে গেল দিন দু'চার।।

রুবাই-২২
গিয়ে দেখ, গগনচুম্বী অট্টালিকা কোথায় হায়।
বড় বড় নামী দামী বাহরাম-জামশেদ যেথায়।।
এখন সেথায় পেঁচা ডাকে এখন সেথায় মাকড়সায়—
জাল বোনে আর এখন সেথায় কাক-ছুঁচোতে বীণ বাজায়।।

রুবাই-২৩
ফুলের ভারে ওজন যাদের করা হত নিত্যপ্রতি।
সেই সুকুমার বারাঙ্গনার শোভায়মান কোমলমতি।।
এবং তাদের ভুগত যারা সুসজ্জিত রাজকুমার—
ফুল-শয্যায় করত কেলি নিত্যনতুন প্রেমপ্রীতি।।

রুবাই-২৪

তারাই আজি ঘুমিয়ে আছে কঠিন ভূমি শয্যা' পরে।
ঘুমিয়ে আছে চির ঘুমে, প্রিয়, সুখ-দুখেরই অন্তঃপুরে।।
পশুর গুঁতো খেয়েও যাদের ভাঙত নাকো সুখের নীদ—
হায়! আজকে ক্রুর-কাঁটা ফোটে তাদের অঙ্গ' পরে।।

রুবাই-২৫

যেথা যেথা পড়ল আমার ঊষ্ণ রক্ত এই ভূপাল।
আমার যাবার পথে ফোটে মিষ্টি মধুর গোলাপ লাল।।
এবং ফোটে এই গুচ্ছে কণক চাঁপার রঙীন ফুল—
তাদের রঙে হবেই রঙিন কোনো সুমুখীর ফরসা গাল।।

রুবাই-২৬

পিয়ো, প্রিয়ে! কাছে বসো, শুনো না, কী বলে বিদ্বান।
হেথায় শুধু, সুনিশ্চিতই, এ জীবনের, হয় অবসান।।
নিশ্চয়তা আছে শুধু মিথ্যা সে আর ধ্যান-ধারণায়--
নাও শুনে ওই আসল কথা ঝরলে ফুল আর পায় না প্রাণ।।

রুবাই-২৭

পণ্ডিত ও বিদ্বানদের জীবনে থাকে জ্ঞান অনেক।
স্বয়ং আমি বুঝতে গেছি যুক্তিতর্ক জ্ঞান-বিবেক।।
মুক্তো খুঁজে দেখতে গেলাম হারাল ঝিনুক জীবন তার—
কস্তুরি সে খুঁজতে গেলাম ছুটল দিয়ে ঝড়ের বেগ।।

রুবাই-২৮

সঙ্গী-সাথী, যত ছিল, প্রিয়ে! তারা মৌন হল।
জীবন ভরে মধু পিয়ে কবেই তারা ঘুমিয়ে গেল।।
এবং, আজ তাদেরই মাটির' পরে আমি তুমি ফুর্তি করি—
হায়! কাল আমাদের মাটির' পরে বুঝব কী'কে খেলে গেল?

রুবাই-২৯

ওরে! লোটো মজা নাও লুটে নাও, যৌবন? সে তো দিন দু-তিন।
হায়! অন্তে শুধু হবে জেনো অনন্ততে সব বিলীন।।
অন্তে যে হায় কোথায় পড়ে রবে সে হায় উমর খৈয়াম—
সুরাবিহীন, সঙ্গিনীহীন, সঙ্গীতহীন, ও অন্তবিহীন।।

রুবাই-৩০

ওই ইবাদতখানায় কত চলছে সদা সুসন্ধান।
মক্তবে ওই লাভ করছে রীতি-নীতির পূর্ণজ্ঞান।।
ওই দুইকেই ডেকে বলে নিরাশ-রাতের সেই সে দূত—
বলছে তাদের, 'মিথ্যা পথে ঘুরছ কেন ও নাদান!!'

রুবাই-৩১

জন্মমৃত্যুর, রুদ্ধদ্বারে, কত-না জ্ঞানী লড়াই করে।
খুলতে তারা ব্যর্থ হল শত লক্ষ চেষ্টা করে।।
কেটে গেল কত সে যুগ কিতাব পুঁথি খুঁজে খুঁজে—
এই জীবনের রহস্য কেউ পায়নি লাখো চেষ্টা করে।।

রুবাই-৩২

বিজ্ঞানেরই জ্ঞাতা যত বেদান্তী ও শাস্ত্রজ্ঞানী।
এক এক পদের অর্থ তারা করে গেল মনমানী।।
কালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে হারিয়ে গেল তাদের জ্ঞান—
দেখ, যৌবনসুখ হারিয়ে তারা জীবন কাটায় ব্যর্থ জ্ঞানী!!

রুবাই-৩৩

ব্যর্থ হতে দিও না প্রিয়! যৌবনের এ মধুর দিন।
পান করে নাও আর দু চুমুক হোক এ হৃদয় শান্তি লীন।।
নিশ্চিত একটা কথা, প্রাণপাখী সে যাবে উড়ে—
ফুটন্ত ফুল ঝরে যাবে র'বে না এ সুখের দিন।।

রুবাই-৩৪

কত কাল, কত কাল, প্রিয়! ফিরবে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে?
আর কতকাল চলবে বল দীন-দুনিয়ার তল্পি বয়ে?
এসো, পাত্র দাও ভরে ফের, প্রাণ ভরে পীলো খৈয়াম—
সুখ-দুঃখের চাঁদ তো এটাই নিত্য নতুন যায় সে ক্ষয়ে।।

রুবাই-৩৫

ভাগ্য-দোষের করে অভিযোগ বসে তো আছ অষ্ট যাম।
তাই না দেখে লাজে মরে এই দুনিয়া, হে খৈয়াম।।
হায় ধিক্কার হৃদয় তোকে, জাগল যে প্রেমের পীর—
আরো ধিক্কার, সেই অধরের, চাখল না যে মধুর ধাম।।

রুবাই-৩৬

'অস্তি' নাস্তি এ ফারাকের আমার কিছু আছেও জ্ঞান।
আরো সহজে করতে পারি 'উঁচু-নিচু'-র এই প্যাহেচান।।
কিন্তু সত্য এটাই সে তো বিদ্যা কিছু আমারো আছে—
অষ্ট-অঙ্গ ডুবিয়ে দেখি এটাই মদিরা রস ও পান।।

রুবাই-৩৭

এই মদিরা রসময়ীর বিশ্বমোহিনী জড়ের মূল।
সঞ্জীবনী-বুটিকা হরে ক্ষণ-জীবনের বেদনা শূল।।
অন্দরে যার করলে প্রবেশ সকল মত ও পথ 'খৈয়াম'—
সাথে সাথে সব হয়ে যায় সব ভেদাভেদ সুনির্মূল।।

রুবাই-৩৮

এক নিমেষে যায় যে ধুয়ে ঝুঠা জগতের মায়ামোহ।
এক মুহূর্তে যায় যে মিটে পরস্পরের বিদ্রোহ।।
স্পর্শমণি-পুণ্যময়ী-মদিরা-ছোঁয়ামাত্র, সাকী—
পরশমণি যায় গো বনে খোটা জীবনের সেই লৌহ।।

রুবাই-৩৯

অবশ্যই, যৌবনেরই, আবেগতপ্ত, সাকী! আমি অনেকবার।
খুঁজে অনেক ফিরনু আমি সাধু-সন্ত গুণীর দ্বার।।
কূটতর্কের বেড়াজালে জড়িয়ে গেলাম কিন্তু হায়—
পেলাম না ভেদ, ফিরে এলাম, সব দুয়ারে মেনেই হার।।

রুবাই-৪০

চালাক-চতুর, জ্ঞানী-গুণিদের, সঙ্গে বসে, জ্ঞানের বীজ।
নিজহাতে বপন করে খুব ঝরালাম ঘাম-পসীজ।।
জীবনভরের পরিশ্রমের সব শেষে এই মিলল ফল—
'বানের মতো ধেয়ে এলো উড়ল ঝড়ে সব সে চীজ।।'

রুবাই-৪১

কোন সে দূরের দেশের থেকে, কেন কাহার ইচ্ছাতে হায়।
এসেছিল পানিস্রোতে নিরুদ্দেশ ও নিরুপায়।।
ঝড়ের মুখে মুখ ঝুঁকিয়ে জগৎ ত্যাজে, ও খৈয়াম—
জানে কী কেউ, দূর দেশকে
অর্থশূন্য, ব্যর্থ ও আর অসহায়?

রুবাই-৪২

আমার অনুমতি বিনা জগতে আমায় কে পাঠালে?
এবং, একইভাবে, জগৎ থেকে, অন্তে আমায় দেবে ঠেলে।।
ধুতেই যদি হবে আমার মনের ময়লা কলঙ্ক সে—
পেয়ালা ভরো একের পর এক, সাকী! মদিরাপাত্র ধরো তুলে।।

রুবাই-৪৩

বুদ্ধি-যানে চড়ে আমি দেখে এলাম আকাশ-পাতাল।
জ্ঞান-সিন্ধুর সাগর সেঁচে দেখে দেখি অমূল্য রত্ন-জাল।।
এই জীবনের জটিল জালের গ্রন্থি সে তো অগণিত—
সে সমাধান পাইনি প্রিয়ে! কুটিল কালের গ্রন্থি করাল।।

রুবাই-৪৪

কূটিল গ্রন্থি হয়নি মোচন, মিলল নাকো জীবন-সার।
অন্ধবুদ্ধি জ্ঞানালোকে খুঁজে ফিরি এ সংসার।।
মনের পিয়াস মিটবে তখন সুখ-দুঃখের ভেদ ও ভাব—
শরণ নেবো প্রিয়তম মাটির তৈরি এক পেয়ালার।।

রুবাই-৪৫

এই যে মাটির পেয়ালাও কখনো হবে স-জীব, স-কাম।
কেন না অধর অধরে মিলিয়ে করবে প্রেমের রসের ধাম।।
আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে, 'নাও, ভরে নাও, ভুল কোরো না'—
একবার যে যায় সে চলে ফেরে না কভু, 'ওমর খৈয়াম'।

রুবাই-৪৬

নাও পেয়ালা ভরে ভরে, ভরে ভরের কী সে ফল?
হাত থেকে হায় যায় বেরিয়ে লক্ষ লক্ষ এক এক পল!
কালকে যা সে হবার ছিল কে জানে তার হয়েছে কাল—
আজকে কাটে স্বস্তিতে আর 'কাল'-কে কেন হয় বিকল?

রুবাই-৪৭

আজকে সুখে কাটল যে দিন 'কাল'-উপর ছড়াও ধুল।
লৌকিক-পারলৌকিকেরই মরা ঝঞ্ঝাট জেনো সে ভুল।
এই জীবনের অমূল্য পল ব্যর্থ হতে দিয়ো না আর—
প্রণয়িনী! কাছে এসো, প্রেমসুধাপান করি বেভুল।

রুবাই-৪৮

এটাই যদি হয় মদিরা, লাল হয়েছে প্রিয়া-নয়ান।
নশ্বরতা আসল সত্যনশ্বরতা আসল প্রমাণ।
যাবৎ বাঁচো, লুট করো সুখ যমদূত সে আসবে যখন—
বিষ-পেয়ালা ধরবে মুখে, হেসে হেসে করবি পান।

রুবাই-৪৯

প্রিয়তম! মনের সুখে রস লুটে নাও, দাওগো ধেয়ান।
বিচিত্র এ জগৎচক্রে আছে ছায়া দীপ-সমান।
সূর্য-প্রদীপ জ্বলছে তাতে আমরা আছি চারদিকে তার—
কল্পিত সব চিত্রছায়া চক্কর খায়, সে হয়রান।

রুবাই-৫০

আমি তুমি গুটি কেবল শতরঞ্জের জগৎ খেলায়।
দিন-রাত্রি দুইই আছে, সাদা-কালোর এই মেলায়।।
এধার-ওধার চাল সে চেলে খেলোয়াড়ে দেয় যে মার—
অনন্তেরই পিটারিতে অন্ত করে দেয় সে হায়।।

রুবাই-৫১

এবং, এ ভাগ্যের আঘাত খেয়ে কোরো নাকো কান্না-বিলাপ।
ডাইনে-বামে যেদিক চলো যাও নীরবে সে চুপচাপ।।
এই চৌগান ভূমিতে তোকে ফেলল তোকে এ খৈয়াম—
তিনি সে তো জানেন সবি, রুসবি জানেন আপনি আপ।।

রুবাই-৫২

ভেবো নাকো একবার যে, যাবে তুমি জগৎ ছোড়।
পয়দা কভু হবে না জেনো এ জগতে তোমার জোড়।।
নিত্য যেমন ঢালে সাকী বুদবুদ সে অসংখ্য—
নিয়তি তেমন ঢালতে থাকে তোমার চেয়ে খৈয়াম ক্রোড়।।

রুবাই-৫৩

যেদিন প্রথম প্রাচীর দিশায় জাগল অরুণ-কিরণ-জাল।
সে দিন থেকে শুরু হল চাঁদ-তারকার চলন-চাল।।
ওই, ওদিন বিধির নির্মম আর নিডর কলম এ খৈয়াম—
সেদিন থেকে রাখল লিখে অন্ত-আদির সকল হাল।।

রুবাই-৫৪

যা-ইচ্ছা খাও পান করো, ব্রত-উপোস, করোও কখন।
চুপি-চুপি দুঃখ সুখও, যাওও তুমি করে সহন।।
চাও যদি সে অশ্রু দিয়ে শত সাগর ভরতে খৈয়াম—
লাখো চেষ্টায় পারবে নাকো খণ্ডাতে এ ভাগ্য-লেখন।।

রুবাই-৫৪

অবশ্যই, এ ক্রুরচক্রের, চলে না সামনে, কোনোই উপায়।
অন্ত যে তার, ভাগ্যের হাতে, যায় গো রয়ে তাহার ন্যায়।।
কোত্থেকে কে, এসেছিল, কেন; কোথায় অন্ত তার?
প্রশ্ন শুধু করতে জানি উত্তর কে বলবে হায়?

রুবাই-৫৬

এবং, অধোমুখে, পানপাত্র, বলছে যাকে, আকাশ।
যার নিচেতে, চক্ষুমুদে, বেঁচে আছি, হচ্ছি নাশ।।
তার দিকে হাত বাড়িয়ো নাকো, মেগো না ক্ষমা ভিক্ষা কোনো—
এই নিয়তির মার তো সে যে, ভ্রান্তি আর নিরাশ।।

রুবাই-৫৭

জীবন-ভোরে এ ললাটে লিখেছিলে জীবনকর্ম পথ-করাল।
বিছিয়েছিলে পদে পদে বিষ-কাঁটারই কঠিন-জাল।।
ফেঁসে গেলাম তাতেই আজি, এতে আমার দোষ কোথায়—
ভেজাল সোনা চুকাই কিসে, পেয়েছি যখন ভেজাল মাল?

রুবাই-৫৮

এবং শোনো, এক দিবসে, পৌঁছে গেলাম, কুমোর দ্বার।
সেথায় আমি দেখনু গিয়ে রকম-রকম ভাঁড় অপার।।
তাতে কিছু ছিল আবার মূক-বধির ও চেতনাবিহীন—
কিছু সেথায় বসে বসে করতেছিল তর্ক-বিচার।।

রুবাই-৫৯

বলছিল কেউ, আচ্ছা যখন, মুঠি ভরে, দাওগো ধূল।
কুশলী সে দু'হাত দিয়ে স্ব-ইচ্ছাতে, যা অনুকূল।।
সুন্দর আমার মূরতখানি, হবে কী গো অন্ত হেথায়—
ভেঙে-চুরে আগের মতোই, হয়ে যাবে মাটির ধূল?'

রুবাই-৬০

বলল কেহ,' কক্ষনো নয়, সৃজন-সহন, এ অবিরাম।
ব্যর্থ কভু পারে না হতে, মন্দ কভু, এর পরিণাম।।
সাকী! মনের সাধে, পান করো আর, তৃষ্ণা মেটাও—
পাগলেও ভাঙে না তা, বে-মতলবে, পাত্র ললাম।।

রুবাই-৬১

হঠাৎ কেহ বলল উঠে, রূপহীন এক পাত্র-সরোষ।
'আমার এ রূপ করল কুরূপ এ কী কুম্ভকারের দোষ?
স্বহস্তে তাঁর তিনি সবার, দান করল, যে গুণাগুণ--
কেউ একজন ভুগবে নরক, কে ভুগবে সুখ-সন্তোষ?'

রুবাই-৬২

এ কথা শুনে নীরব সবাই, এক সে পাত্র, করে পুকার।
'আমার মাটি শুকিয়ে গেছে, বিস্মৃতির সেই সে দ্বার।।
মদিরা-সুধা, চিরপ্রিয়া, পাই যদি তার দু'চার বুঁদ—
তখন আমার হতেও পারে নয়া-জীবনের, সুসঞ্চার।।

রুবাই-৬৩

জীবনপাত্রে থাকতে আয়ু, ঢালো মধু, স্বচ্ছন্দ।
এবং যখন, যাবে চুকে, এ জীবনের, সবদ্বন্দ্ব।।
দ্রাক্ষা রসে চুবিয়ে নিয়ে, পাত্র-অঙ্গ, দাও দাও মাখিয়ে—
কোথাও আমায়, দাফন কোরো, পুষ্পবনে সানন্দ।।

রুবাই-৬৪

মোর কবরের মাটি থেকে বেরিয়ে এলো এমন ফুল।
সুগন্ধে তার ভাসল ভুবন গন্ধ-মদির মাটির মূল।।
মদ-বিরোধী, কট্টরও যে, গেলে একবার, তার পানে—
সু-উন্মত্ত হয়ে যাবে ভুলবে ধর্মকর্ম মূল।।

রুবাই-৬৫

বলছ তুমি, মহাদোষ ওই, মদপাপীকে করো দূর।
এর পিছনে ভুগবে তুমি নরক-জ্বালা করো দূর।।
সত্য এ তো, উভয় লোকের, সুখশ্রী-তে! এগিয়ে আরো—
এক মুহূর্তে, মদিরা পিয়ে, যাই হয়ে যাই, আবার চুর।।

রুবাই-৬৬

বৈরিতা নেই, ধর্ম-সনে, নেইকো বিশেষ, পাপ-প্রীতি।
মন্দ কিছুই, লাগে না যে, বেবাত লোকের, কোনো রীতি।।
যে পেয়ালায় মরি আমি, এরি তরে, এ খৈয়াম—
এক ঘড়িও যাই না ভুলে, ভাগ্যচক্রের, নিঠুর-নীতি।।

রুবাই--৬৭

যদিও হল সূরার পিছে কলুষিত মোর কীর্তি অমোল।
এবং লাখো স্বপ্ন গেল দু'চুমুকের পানির মোল।।
তবুও, তবুও, হইগো আমি, মূর্খতাতে, বিস্মিত—
মদিরা বেচে মদিরা কেনে মদিরা হতে কী সে মোল?

রুবাই-৬৮

আমার পাণ্ডুলিপি 'পরে আছে জীবনের কী সে পোল?
খুঁজে তাদের দাওগো বলে প্রাণদণ্ডের মাথার মোল।।
বাক্যবাগীশ এই জ্ঞানীদের সে যোগ্যতা নেই অতটা—
যার সুমুখে, মিত্র আমি, খুলতে পারি, মনের পোল!!

রুবাই-৬৯

বন্ধু! কভু, শুনেছিলে, এই অদ্ভুত, কথন-বাত?
চিৎকারিয়া, কাঁদছে মোরগ, হতে দেখে, এই প্রভাত?
বলছে শোনো,' দিবাকরের, প্রথম কিরণ, বার্তা দেয়—
'এই জীবনের পাত্র হতে ঝরে গেল আরেক রাত!'

রুবাই-৭০

হ্যাঁ! দু'দিনেরই, ফুলের শেষে, হারিয়ে যাবে, এ মধুমাস।
কথায় কথায় যায় গো কেটে যৌবনের উল্লাস-বিলাস।।
আসা-যাওয়ার চলার পথে সামান কিছু গুছিয়ে নিই—
সময় বলে, কোথায় সময়, মেটাবে এত, প্রেম-পিয়াস?

রুবাই-৭১

প্রিয়তম! আমি তুমি এ নিয়তির সঙ্গে মেল
করতে পারি নিজের হাতে জীবন-দুখের এই সে খেল।।
আবার তাকে মিটিয়ে দিয়ে করতে পারি সৃষ্টি নবীন—
মনের সাধে পুজি যাতে ফলে আবার আশার বেল।।

রুবাই-৭২

চন্দ্র-উদয় হল আবার কাটল আরেক দিন যে, হায়।
পূর্ণ হল এক লহমায় জীবনগাথার এক অধ্যায়।।
পাত্র ভরো, চন্দ্রমুখী, গিয়ে পুনঃ, আসবে ফিরে—
যে গিয়েছে আসবে না সে যতই করো কোটি উপায়।।

উ প ন্যা স

মেকাইল রহমান

কাঙালনামা

চার

দিন কাটে, রাত কাটে।

দামাল প্রতিদিন স্কুলের শেষে বাড়িতে ফিরে কোনোরকমে তাড়াতাড়ি করে বইখাতার ব্যাগটা রেখে হাতমুখ ধুয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে জ্ঞানেন্দ্র দাদুর উদ্দেশে।

তার মা বলে, এক মুঠো খেয়ে যাবিনে রে? কী যাদু যে করলেন জ্ঞানেন্দ্র বাবা! ছেলে আমার এমন করে ছুটছে কাঙাল বাড়ির জন্যে, যেন এককালে সে ওই বংশেরই নাতি পোতা ছিল! ওরে দামাল, কই রে ওরে!

দামালের ছোটোবোন মহিমা জানায়, কখন উড়ে বেরিয়ে গেল দাদা! কাকে তুমি এখনও ডাকাডাকি করছ, মা?

পরমানন্দে মা বুকে জড়িয়ে ধরে মহিমাকে। বলতে গেলে, তার ভিক্ষুকপুত্র স্থান পেয়েছে রাজদরবারে! আনন্দ হবে না তার?

দামাল নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার শেষাংশ তার সতেজ কণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে কাঙাল বাড়ির মূল ফটক দিয়ে ভিতরে ঢোকে :

'বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না ...'

বারান্দায় উঠতে-না-উঠতে, আবেগে উত্তেজনায়, মুখ তার লালাভ হয়ে যায়।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল করতালিতে সরব মুখর হন।

বড়োবউমা থালাবাটি ভরে এনে দেয় ভাত-তরকারি। এ বাড়িতে প্রতিদিন দুবেলা মাছ-মাংস হয়। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র দাদু আমিষ কিছু ছোঁন না ব'লে দামালও এসব খায় না।

তার খাওয়া শেষ হলে চলে প্রশ্নোত্তর।

এক সময় দামাল তার দাদুকে বলে, দাদু, আমার কী মনে হয় জানেন?

দাদু বলেন, বল। কী মনে হয় তোর?

—আমার মনে হয় আমরা সবাই একদিন এক ছিলাম।

— মনে হয় কেন? এটাই তো সত্যি। কিন্তু কেন হঠাৎ এমন মনে হল তোর?

—আজ স্কুলে ইতিহাসের স্যার যা বললেন, তা শোনার পর থেকেই আমার এমন মনে হচ্ছে।

— কী বলেছেন আজ তোর হিস্ট্রি টিচার?

—গণরাজপুর ও ধনরাজপুরের গল্প বললেন আজ স্যার। শুনে তো পুরো ক্লাস থ!

—কী রকম?

—জাস্ট আপনি ভাবতে পারবেন না। কেউ আর কথা বলতে পারছিল না।

— তাহলে তো বলতে হবে একটা রুদ্ধশ্বাস কাণ্ড ঘটে গেছে আজ তোদের ইতিহাসের ক্লাসে।

— ঠিক তাই। আরে বাবা! কেউ আজ পর্যন্ত আমাদের অমন করে বোঝাতে পেরেছেন যে, সত্যিই আমরা সবাই একদিন এক ছিলাম? পারেননি। কিন্তু আজ বুঝলাম।

—তা গল্পটা কী বললেন তিনি? আমাকে শোনাবি তো আগে! কৌতূহলের ঠেলায় আমারই যে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—সে এক দারুণ মজার গল্প, দাদু। ভেরি ইন্টরেস্টিং।

আজ থেকে কম করে সাতশো আটশো বছর আগে সমগ্র বালিয়া পরগণায় মানুষের বসতি বলে তেমন কিছু ছিল না। দক্ষিণে ছিল সাগর। আর উত্তরে ছিল পাহাড়। পশ্চিমদিকে কলকাতা তখনও পুরোপুরি শহর হয়ে ওঠেনি। পুবদিকে

এর মধ্যে ঠিক কবে এসে হাজির হল মানুষ প্রথম, তা কে বলবে? সে-মানুষের কী জাত ছিল? কী ধর্ম ছিল তার? কবে তারা হিন্দু হল? কবে তারা মুসলমান হল? এ সবের হিসাব কে দেবে? প্রকৃতি তার আশ্রয়। মহাকাল তার পরিচালক। প্রাণ ধারণ করাই তখন তার লড়াই। কত কাল ধরে যে মানুষ দিনাতিপাত করেছে তার মতো করে। যেমন পেরেছে তেমন। সেই গুহার মানুষ, বন জঙ্গলের মানুষ, নদী তীরের মানুষ, ভূমিলগ্ন মাটির মানুষ কে? হিন্দু? মুসলমান?

ইছামতী নদী ছিল বটে, কিন্তু বাংলাদেশ বলে আলাদা কোনো দেশ ছিল না ওপারে। তখন এইসব অঞ্চলে ছিল নদীনালাময় জলাভূমি, ঝোপ জঙ্গলে ভরা বন বাদাড় আর শ্বাপদ প্রাণী।

এর মধ্যে ঠিক কবে এসে হাজির হল মানুষ প্রথম, তা কে বলবে? সে-মানুষের কী জাত ছিল? কী ধর্ম ছিল তার? কবে তারা হিন্দু হল? কবে তারা মুসলমান হল? এ সবের হিসাব কে দেবে? প্রকৃতি তার আশ্রয়। মহাকাল তার পরিচালক। প্রাণ ধারণ করাই তখন তার লড়াই। কত কাল ধরে যে মানুষ দিনাতিপাত করেছে তার মতো করে। যেমন পেরেছে তেমন। সেই গুহার মানুষ, বন জঙ্গলের মানুষ, নদী তীরের মানুষ, ভূমিলগ্ন মাটির মানুষ কে? হিন্দু? মুসলমান?

শুনতে শুনতে জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল বিস্ময়ে কৌতূহলে বিস্ফারিত হলেন।

দামাল বলে যায় তার ইতিহাস-শিক্ষকের গল্প।

কালক্রমে সেই মানুষের বংশবৃদ্ধি হল। প্রাকৃতিক সম্পদের ভোগদখল নিয়ে হানাহানি করল মানব সন্ততি। তারা হিন্দু হল। তারা মুসলমান হল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের রাজরাজড়াদের যুদ্ধবিগ্রহের খবর পেয়ে পরস্পর লড়াই-বিবাদ করল তারাও। ক্রমে ক্রমে উপসাগরের বালুতট সরে যেতে লাগল দক্ষিণে। চওড়া নদীরা সরু হল। জলাভূমি ভরাট হল। সাবাড় হল বাদাবন। কত মানুষ! কত ঘরবাড়ি!

এমন সময় একদা সকলকে ছাপিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল গণরাজ ও ধনরাজ নামের দুই যুযুধান, রাম ও রাবণের মতো, হাসান-হোসেন ও এজিদের মতো।

ধনরাজ বলল হুঙ্কার দিয়ে, এই তামাম পরগণার প্রকৃতির সম্পদ সব আমার!

গণরাজ প্রতি হুঙ্কার দিয়ে বলল, এই তামাম পরগণার সমস্ত জনগণ আমার!

দুই পক্ষে লড়াই হল। হারজিত হল। আবার লড়াই। আবার হারজিত।

জনগণ হল অতিষ্ট। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আর ক্লান্তি শ্রান্ত অবসন্ন করল তাদের। বিরক্ত প্রকৃতিও। বন্যায়, ঝড় ঝঞ্ঝায় আর ভূমি-কম্পে সে ফুঁসে উঠল। এরপর যুদ্ধ থামল। সন্ধি হল। চুক্তি অনুসারে গণরাজ তার অধিকারে থাকা সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে দিল ধনরাজকে। তির-ধনুক, বর্শা-বল্লম, ঢাল-বর্ম, লাঠি সোটা সব। সোনা-রূপোর ভাণ্ডার ছিল। পিতল-কাঁসা-তামার হাড়ি-কলসি ছিল কত! ধানের গোলা ছিল। কাঠের মজুত ছিল। নৌকা ছিল। ঘোড়ার গাড়ি ছিল। গণরাজ তার সব সম্পদ দিয়ে দিল ধনরাজকে। বিনিময়ে ধনরাজ তার অধীনস্থ কতিপয় পারিবারিক সদস্য ও নির্বাচিত কর্মচারী ব্যতীত সমস্ত লোক লস্কর দিল গণরাজকে।

সেই থেকে সকল শ্রেণীর মানুষের রাজা হয়ে থাকলেন গণরাজ। ... তিনি একটা কথাই বলে গেলেন, ও এই আমার গণরাজপুরের প্রজাসকল, আমি স্বেচ্ছায় সর্বহারা হলাম তোমাদের ভালোবাসার খাতিরে। তোমরাও পরস্পরকে চিরদিন ভালোবেসে যাও!

ওদিকে ধনরাজ থাকল ধনসম্পদ নিয়ে ভোগ-বিলাসে ডুবে।

এক সময় দু'জনেরই মৃত্যু হল হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে।

তারপর থেকে গণরাজের সাম্রাজ্য গণরাজপুর এবং ধনরাজের সাম্রাজ্য ধনরাজপুর নামে পরিচিত হয়। এখানকার মানুষই দিয়েছে এই নাম।

নিজের এলাকার এই ইতিহাস জেনে অবধি দামাল এক অপূর্ব উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে ছিল। দাদুকে সব জানাতে পেরে একটু যেন হালকা হল তার ভেতরটা।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল অভিভূত হলেন। তিনি জানতে চান, তোদের স্কুলে, দাদুভাই, কত হিস্ট্রি-টিচার এলেন গেলেন। কিন্তু বালিয়ার ইতিহাস এত করে কাউকে শেখাতে শুনিনি। কী নাম রে এই মাস্টার মশাইয়ের, দামাল?

> মুসলিমরা বেশিরভাগ মূর্খই ছিল এই এলাকায়। এখন তারা কত অ্যাডভ্যান্সড্! উচ্চশিক্ষিত। স্কুলে শিক্ষকতা। গবেষণা। ভাবাই যায় না। বাড়ির পাশেই এত বড়ো ইতিহাস সাধক রয়েছেন। আর আমি তাঁকে এতদিন চিনি নি জানি নি! দেখতো, দামাল, কত সুন্দর একটা ব্যাপার। মাটিয়ায় বসে তিনি আমাদের এই অঞ্চল সম্পর্কে কত নিবিড় চর্চা করেছেন। আর আমরা কতকাল এখানে আছি, অথচ কিছুই জানিনি, জানার চেষ্টাও করিনি, নিজেদের ইতিহাস। আমার হয়ে কাল তুই স্কুলে গিয়ে ধন্যবাদ জানাস ওই জ্ঞান সাধককে। আর বলিস, আমার দাদু আপনাকে দেখতে চান!

দামাল বলল, শোহন আলি।

—ইন্টরেস্টিং! নামটা শুনতে হিন্দু হিন্দু। কিন্তু আসলে মুসলিম! উনি আসেন কোথা থেকে?

—মেটে থেকে।

—মানে আমাদের মাটিয়া?

—হ্যাঁ তো।

—ওখানেই বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—কী আশ্চর্য! সময় কত পাল্টে গেছে!

মুসলিমরা বেশিরভাগ মূর্খই ছিল এই এলাকায়। এখন তারা কত অ্যাডভ্যান্সড্! উচ্চশিক্ষিত। স্কুলে শিক্ষকতা। গবেষণা। ভাবাই যায় না। বাড়ির পাশেই এত বড়ো ইতিহাস সাধক রয়েছেন। আর আমি তাঁকে এতদিন চিনি নি জানি নি! দেখতো, দামাল, কত সুন্দর একটা ব্যাপার। মাটিয়ায় বসে তিনি আমাদের এই অঞ্চল সম্পর্কে কত নিবিড় চর্চা করেছেন। আর আমরা কতকাল এখানে আছি, অথচ কিছুই জানিনি, জানার চেষ্টাও করিনি, নিজেদের ইতিহাস। আমার হয়ে কাল তুই স্কুলে গিয়ে ধন্যবাদ জানাস ওই জ্ঞান সাধককে। আর বলিস, আমার দাদু আপনাকে দেখতে চান!

– সে হবেখন । কিন্তু, দাদু, আপনি তো আসল কথাটাই তাঁর শোনেননি এখনও।

– কী তাঁর আসল কথা? এত কথার পরেও কি এখনও আসল কথা বাকি থাকে? কী? বল তুই। শুনি।

—ওই যে শুরুতেই আমি বললাম না! আমরা সবাই একদিন এক ছিলাম। এ-কথা তো তিনিই বলেছেন।

—কথাটা তো নতুন কিছু নয়। দরকার নতুন যুক্তি। তিনি কি এর সাপোর্টে নতুন কিছু যুক্তি দিতে পেরেছেন?

– সেটাই তো মজার, দাদু। কোনো মনগড়া যুক্তিহীন কথা তিনি বলেননি। সব মানুষই এক – এই কথাটা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে স্যার আমাদের গণরাজপুর ও ধনরাজপুরের ইতিহাসের গল্প শুনিয়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল ইতিহাসের শিক্ষক শোহন আলির প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, দামালের মুখে শোনা-কথায়, যে তিনি এই জ্ঞানী ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের ঔৎসুক্যে ব্যগ্রব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, দামাল ভাই, এক আশ্চর্য মানুষের কথা তুই আজ আমাকে শোনালি। মনটা আমার ছটফট করছে। তুই কালই ভদ্রলোককে আমার কাছে নিয়ে আয়। তাঁর গল্প বাকিটা আমি তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনব।

দাদুর উৎসাহ দেখে আনন্দে আত্মহারা হল দামাল।

পাঁচ

এই আসে, এই আসে। আজ আসে, কাল আসে। এই করতে করতে এক সপ্তা পার হয়ে গেল। গণরাজপুর ধনরাজপুর হাই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক শোহন আলি আর আসেন না।

দামাল প্রতিদিনই বলে, স্যার একটু ব্যস্ত আছেন। আমি ভালো করেই বলেছি। উনি আসবেন বলেছেন। দ্যাখেন না আসেন কি না! এত উতলা কেন হচ্ছেন, দাদু?

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল বলেন, আসলে কী জানিস, দামাল! আমি চিরদিন বায়তাড়া মানুষ। মনে একটা কিছুর উদয় হলে, আর ত্বর সয় না। ওই যে তোর গল্প শুনে একবার তাঁর সাথে আমার মনের যোগ হয়ে গেল। আর অমনি একটা বাতিক উঠে গেল। যতক্ষণ না দেখা হচ্ছে একবার, ততক্ষণ মনটা ঠাণ্ডা হবে না।

এমন সময় বৈকালিক বৈঠকে গল্পের মাঝেই খবর এল নরেন্দ্র ফিরছে জার্মানি থেকে।

ধনেন্দ্রর একমাত্র পুত্র নরেন্দ্র বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ধাপে ধাপে বিদ্যা বৃক্ষের মগডালে উঠে ম্যাথে অনার্স পাশ করে। বরানগরের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে এম. ম্যাথ। এরপর ছাত্রবৃত্তি নিয়ে মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ্ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ থেকে গবেষণা সেরে পুনরায় মোটা ছাত্রবৃত্তি নিয়ে চলে যায় ফ্র্যান্সের প্যারিসের কাছে টুলু-তে পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ করতে। সেখান থেকে সোজা জার্মানির ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট। বিশ্ব তার মেধার পরিপোষণ করেছে। তাই নিজেকে সে বিশ্বনাগরিক মনে করে।

সাত বছর ফ্র্যান্স ও জার্মানিতে প্রভূত গবেষণার কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে নরেন্দ্র ফিরছে বাড়িতে।

ধনেন্দ্র আনন্দিত। মেজোবউ ভীষণ খুশি।

জ্ঞানেন্দ্র বড়ো চিন্তায় পড়েছেন শত আনন্দঘন আবেগের মধ্যেও। সাত বছর পরে ফিরছে বংশপ্রদীপ। সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ হয়ে সে ফিরছে তো?

সমস্ত কাঙাল পরিবার আনন্দের উত্তেজনায় উদ্দীপিত।

যশেন্দ্র তার নবোঢ়া কন্যা অংশিতাকে খবর দিয়ে বলেছে জামাই বাবাজিকে নিয়ে আসতে।

প্রেমেন্দ্র গণরাজপুর ও ধনরাজপুরের সবাইকে খবর দিয়েছে। তারা যেন সবাই এসে নরেন্দ্রর সাথে সৌজন্য-সাক্ষাৎ করে যায়।

ধনেন্দ্র তার মোটর গাড়িটাকে ধুয়ে পরিস্কার করে এনেছে ক্লিনারের থেকে। ড্রাইভার বিশ্বনাথ কে বলে রেখেছে। নফরকে সঙ্গে নিয়ে সে যাবে এয়ারপোর্টে নরেন্দ্রকে রিসিভ করতে।

নির্ধারিত সময়সূচি মেনে ফিরল নরেন্দ্র। গড়ে প্রণাম করল সে সকলকে। নফরকে পর্যন্ত।

দাদুকে প্রণাম করলে পরে তাকেই ভর করে দাদু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন প্রিয় নাতিকে। তিনি চুমু খেলেন তার মাখন মাখন গালে।

বিকালে দামাল এলে জমে গেল বৈকালিক বৈঠকের গল্প।

দাদুই দামালকে পরিচয় করিয়ে দিলেন নরেন্দ্রর সঙ্গে। তিনি বললেন, তুই চলে গেলি সাত বছর আগে দেশের বাইরে। তার পরপরই খুঁজে পেলাম দামালকে।

নরেন্দ্র তার সাথে হ্যাণ্ড শেক করলে রোমাঞ্চিত হল দামাল।

নরেন্দ্র বলল, প্রোভার্টি উইন্স লভ। হারলে হবে না, দামাল, জিততে হবে।

দাদু বলেন, একদিকে রোঁমা রোঁলা। আর একদিকে আলবার্ট আইনস্টাইন। মাঝে রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বকবি যেন দুই দেশের দুই বন্ধুর হাত ধরে মাঝখানে থেকে সব ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন, দুটো দেশকে মিলিয়ে দিলেন। আর সেই মহান মিলন আজ এত বছর পরে আবিষ্কার করল বালিয়ার ধনরাজপুরের নরেন্দ্র কাঙাল, দ্য গ্রেট গ্রাণ্ড সন্ অফ্ জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল। আই অ্যাম প্রাউড অফ্ ইউ, দাদুভাই, আই অ্যাম প্রাউড অফ্ ইউ!

দাদু বললেন, ইয়েস, দাদুভাই, ইয়েস। ইন্‌সপায়ার হিম।

নরেন্দ্র বলল, বিদেশ ভ্রমণ না করলে মন বড়ো হয় না, দাদু। বিশেষ করে, ওড়া দরকার। বি অ্যা ফ্লাইয়ার অ্যাণ্ড সী দ্য ওয়ার্ল্ড। ফ্র্যান্সও ঘুরলাম। জার্মানিও ঘুরলাম। বিবিধের মাঝে দেখলাম 'মিলন মহান'। এ এক ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স।

দামাল হা-করে শোনে।

দাদু বলেন, একদিকে রোঁমা রোঁলা। আর একদিকে আলবার্ট আইনস্টাইন। মাঝে রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বকবি যেন দুই দেশের দুই বন্ধুর হাত ধরে মাঝখানে থেকে সব ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন, দুটো দেশকে মিলিয়ে দিলেন। আর সেই মহান মিলন আজ এত বছর পরে আবিষ্কার করল বালিয়ার ধনরাজপুরের নরেন্দ্র কাঙাল, দ্য গ্রেট গ্রাণ্ড সন্ অফ্ জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল। আই অ্যাম প্রাউড অফ্ ইউ, দাদুভাই, আই অ্যাম প্রাউড অফ্ ইউ!

হর্ষহাস্যের হররা ছুটল।

জ্ঞানেন্দ্র হাসেন। নরেন্দ্র হাসে। দামাল হাসে। প্রাণখোলা হাসি দারুণ খুশির। আনন্দের বন্যা বয়ে যায় যেন।

নরেন্দ্রর থাকার জায়গা ঠিক হল তিনতালার পুবের ঘরে। কিন্তু সেখানে সে থাকল না। বলল, একা একা থাকব না। সে বাবা-মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানা গাড়লো নীচে দাদুর ঘরে। এক বেলা সে মায়ের হাতে খেলো, তো পরের বেলা খেলো জেঠীমা-কাকীমার হাতে। বাবার সাথে একদিন বেরুলো ইটভাটা আর মাছের ঘেরি আর দড়িকল দেখতে। পরের দিন বেরুলো জ্যাঠার সঙ্গে গণরাজপুরের মুসলমান পাড়ায় ঘুরতে আর আলাপ-পরিচয় করতে আর মিষ্টান্ন বিতরণ করতে ঘরে ঘরে সবাইকে, যারা দলে দলে এসে তার সাথে করেছে সৌজন্য-সাক্ষাৎ। আলাদা করে সে দামালদের

বাড়িতে গেল। সরবত খেলো পাতি লেবুর। নফরেরও সাধ হল একবার নিয়ে যাবে তার বাড়িতে তাকে। তার সে-সাধও অপূর্ণ রাখল না নরেন্দ্র।

সকালবেলা যশেন্দ্র বলল, চল, নরেন, কোলকাতায় যাই। আর. জি. কর. হসপিটালে ভর্তি আছে হাবার মা আর গণশার বউ। বেমারি হাল। কিছু ওষুধ কিনে দিয়ে আসতে পারলে বেচারাদের বড়ো উপকার হবে। এতদিন পরে গ্রামে ফিরল। এটুকু তো কর। দেখিস সবাই তাহলে তোকে খুব ভালো বলবে। কোলকাতাও ঘোরা হবে। হসপিটালেও যাওয়া হবে। চল, নরেন, দু'জনে যাই।

ছোটোকাকার প্রস্তাবে নরেন্দ্রর কৌতুক হল খুব। রাজি হয়ে গেল সে।

এরপর দামালের কাছ থেকে শোহন সাহেবেরও খবর পেতে আর দেরি হল না। এক বিকালে তিনি চলে এলেন দামালের সাথে।

মাথাভরা কাঁচাপাকা চুল। নাক বরাবর মাথাটাকে দু'ভাগ করে সিঁথি কেটে চুল পরিপাটি করা। টলটলে গোল গোল দুটো চোখের মনি বাই-ফোকাল লেন্সের চশমার কাচ ফুঁড়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। ঘন পুরু গোঁফ। মার্জিত রুচির দীপ্তি ফুটে আছে তাঁর পোশাক-আশাকে। তিনি চেহারার দ্বারা সমীহ আদায় করলেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল ও নরেন্দ্রর।

নরেন্দ্র এই মাস্টার মশাইকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বলল, আমাদের গ্রামের স্কুলের আপনি যে একজন গুণী শিক্ষক, তা আমি ইতিমধ্যে দাদুর কাছে শুনলাম।

শোহন সাহেব বললেন, তোমার কথাও আমি দামালের কাছে অনেক শুনেছি বাবা। এখন তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবার পরে বুঝলাম তুমি সত্যিই অনেক বড়ো হয়েছ। ধন্য তোমার বাবা-মা। ধন্য তোমার পরিবার।

জ্ঞানেন্দ্র বললেন, সাত চল্লিশ সালে স্কুলটা আমরা ক'জন মিলে করেছিলাম। মাঝে এখানকার মাতব্বরি নিয়ে ঝঞ্ঝাট হলে যোগাযোগ ছিন্ন করি। এতদিন পরে আপনি আবার পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন। আপনাকে একবার চোখে দেখতে চেয়েছিলাম। আমার কথা রেখে আপনি যে এই কাঙালের বাড়িতে এসেছেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফর্মালিটি করব না। শুধু বলি, প্রীত হলাম।

জলযোগের নির্দেশ বহন করে দামাল গেল অন্দরমহলে।

এরপর দু'চার কথার ফাঁকে শুরু হল গণরাজপুর ও ধনরাজপুরের ইতিকথা।

কোনোরকম ভণিতা না করে শোহন স্যার বলে চলেন, জানেন তো, আপনাদের এই ধনরাজপুরে প্রথম প্রথম লোকজন নিতান্তই কম ছিল। ধনরাজের বংশধরেরা মানুষের অভাব পূরণ করতে শহর থেকে, বিদেশ থেকে আনতে লাগল মেসিন। তারা পাটকল বসালো। কাপড়ের কল বসালো। সুতোকল করল। লোহার যন্ত্রপাতি দিয়ে নাট বল্টু বানাবার কারখানা করল। শহর থেকে মিস্ত্রি এসে মেসিন চালাতে লাগল। পরে হল ইটভাটা। দূর দক্ষিণ সীমানার জলা নাবালে হল মাছের ঘেরি। পাকা রাস্তা হল। ট্রেনলাইন বসলো। মার্টিন কোম্পানির ট্রেন চলল। কত রকমের মোটরগাড়ি কত সব বাবুদের বহন করে এল আর গেল! কাজের খোঁজে কত জায়গার কত মানুষ এসে ভিড় করল এই ধনরাজপুরে।

ওদিকে গণরাজপুরে চাষের জমি আর ফলের বাগান আর মাছের পুকুর মাত্র সম্বল। ঘরে ঘরে গোয়ালে বলদ। গতরে না খাটলে মাঠে ফসল ফলে না। বিদ্যুৎ নেই। রাস্তা নেই ভালো। ভরসা গরুর গাড়ি আর বাই-সাইকেল আর চরণযুগল। রোগব্যাধিতে সুচিকিৎসার অভাব। শিক্ষার সুযোগও অপ্রতুল।

তখন সেন রাজাদের তাড়িয়ে দিয়ে বাংলা দখল করেছে ইখতিয়ারউদ্দীন বিন্ মহম্মদ বখতিয়ার খলজি। তার দাপটে সব ত্রাহি ত্রাহি রব তুলে ছইছুট হয়ে গেল যে যেদিকে পারলো। ঘটে গেল সামাজিক ওদল-বদল। গণরাজপুরের গরিব মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হল। তখনই প্রথম সম্ভবত গণরাজপুর ও ধনরাজপুরে হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল।

এই জায়গাটায় শোহন মাস্টারকে থামিয়ে দিয়ে জ্ঞানেন্দ্র বললেন, ইতিহাসের এই খানটায় বোধ হয় একটু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, মাস্টারমশাই। কারণ সেন রাজাদের অনেক আগে থেকেই বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান দুটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বাস করত। আমাদের এই এলাকাতেও। কিন্তু আদতে এখানে, মানে এই গণরাজপুর- ধনরাজপুর অঞ্চলে, কোনোদিনও হিন্দুরাজা বা মুসলমান বাদশারা শাসন করেনি। যেটা ছিল তা হল জমিদারদের জমিদারি। যেমন মহেন্দ্র নাথের জামিদারি।

নরেন্দ্র আলোচনায় অংশ নিয়ে বলল, তার মানে আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, দাদু?

জ্ঞানেন্দ্র বললেন, তার মানে আমি এটাই বলতে চাইছি যে, আদিতে সব মানুষ এক ছিল।

নরেন্দ্র বলল, তো অসুবিধাটা কোথায় তাহলে? মাস্টারমশাইয়ের বক্তব্যেরও তো মেইন পয়েন্ট এটাই।

শোহন স্যার বললেন, এক্জ্যাক্টলি! আমি নিজের এলাকার ইতিহাসটা তুলে ধরার পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের এটাই বোঝাতে চাই যে, তোমরা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখ। ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিরিখে ভেদাভেদ করো না। মানব সভ্যতার চিরন্তন মর্মকথা ঐক্য, বিভেদ নয়।

জ্ঞানেন্দ্র বললেন, আজ এই শিক্ষাই জরুরি।

স্তিমিত হল আলোচনা। জলযোগ হল।

শোহন স্যার বললেন, চলো, দামাল, এবার আমরা যাই। বাবা নরেন্দ্র, নিমন্ত্রণ রইল আমার বাড়িতে। দামালকে সাথে নিয়ে একদিন সময় করে যদি একটু আসো তবে ছেলেমেয়ে দুটোকে তোমার সাথে একবার পরিচয় করিয়ে দেবো। বিশ্ব সত্যের আলো তোমার চোখেমুকে যে আভা ফেলেছে, তা ওদের দেখাবো।

নরেন্দ্র বলল, নিশ্চয়ই যাবো একদিন, স্যার।

জ্ঞানেন্দ্র বললেন, আলবাৎ যাবে, দাদদুভাই। আলবাৎ যাবে।

গ ল্প

ফজলুল হক

ডানা

এমন বে-আক্কেল মেঘ তার যাপনের দিনগুলোতে এক মুহূর্তের জন্যও দেখেনি গোলাপি। সকালে নেট খুলে বসেছিল কাদের। অভ্যেস মতো ব্যবসার হিসাব টেনে ওয়েদার রিপোর্ট একবার দেখে গোলাপিকে জানানোও তার নিয়মের মধ্যে পড়ে। গোলাপি এসব জানতে চায় ছাদের উপর তার বহু কাজ থাকে যেগুলো বৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত। রোজ একই প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো প্রথম প্রথম, এখন কাদের নিজের কাজ সেরে গোলাপিকে আবহাওয়ার খবর জানায়। লেপ তোষক, আচার মশলা পাতি রোদে শুকাতে হয়। কাদের আর গোলাপি নামের সাথে নামের কোনো মিল নেই। তবে তাদের প্রেমের নিবিড়তার সীমা নেই। লোকে বলে লায়লা-মজনু। একদিনের জন্যেও গোলাপি মায়ের ঘরে নিশ্চিত নয়। পরেরদিন কাদের গিয়ে হাজিরা দেবে শ্বশুরবাড়িতে। এমন কত ঘটনা তাদের দাম্পত্যজীবনে প্রেমপ্রদীপ জ্বেলে সংসারের মাধুর্য বাড়িয়ে তুলেছে।

আজ স্বামীর কাছে খবর নিয়ে জেনেছিল, কোথাও কোনো অঘটন ঘটেনি, অবহাওয়া দপ্তরও কোনো খবর দেয়নি, অবাঞ্ছিত কোনো খবর ছিল না বলে নিশ্চিন্তে ছাদে কাপড় জামা মেলেছিল। ভালো রোদও ছিল। সেই ভরসায় একটু গা গড়ানো। ক্লান্ত শরীর। ক'দিন ধরে কী যে হচ্ছে বুঝতে পারে না। দুর্বল লাগছে। কাজে মন বসছে না। সংসারের সব কাজ সে একা হাতে করে তৃপ্তি পায় সে কি এমনি-এমনি? প্রেম! বাড়ির লোকজন জানে অন্যেরা মজা পায়। কাজ না থাকলেও খুঁজে খুঁজে কাজ বের করে। বেলা বাড়লে রোদ ওঠে ঝলমলে। একটু জিরিয়ে নিতে গিয়ে চোখের পাতা বুজে এসেছিল, আর অমনি মেঘ বেশ্যারা একেবারে কাপড় খুলে ঢেলে দেয়। হায় হায়! হায়! মোটা মোটা দুটো বিছানার চাদর! মিকসিতে বিরি কলাই বেটে কেলো জিরে ছিটিয়ে বেশ যত্ন করে বড়ি দিয়েছিল চা-সকালে, এখন বারোটা বেজে গেল, কবে যে শুকাবে!

বছরটা বৃষ্টি দিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন ভরা শ্রাবণ, ঢেলে উপুড়ে দিচ্ছে। দিবি দে, এমন ছেনালিপনা কেন। অনেকটা কাদেরের মতো। বলা নেই কওয়া নেই টেনে বিছানায়। ছিঃ! লজ্জাও লাগে না। এমন বুনো ষাড়ের মতো...খেপে ওঠলে সামলানো দায়। রাত বাদে দিনের বেলায় ব্যবসার ফাঁকে যেটুকু সময়, খাট বিছানায় ভরা জোয়ার। নতুন নতুন বিয়ের পর ওবাড়ির গুলু দাদি মুচকি মুচকি হাসছিল। কেসটা কী, জানতে হবে, হাসির কথা কিছু বলেছি কি? বলেছিল, খাসা মরদ পেয়েছিস, দেখবি মায়ের ঘর যেতে চাইবি না।

বলে কী বুড়ি! কীসের বেলায় কীসের তান। তবে তার কথা সত্যি হল কেমন করে গোলাপি বুঝতে পারেনি। শহরের মেয়ে। জিমে যেত। গোটা শহরের লোক ডানপিটে মেয়ে বলে পিঠে পোস্টার চিটিয়ে দিয়েছিল। স্কুল থেকে ছেলেরা লাইন দিয়ে অপেক্ষা করত। কখন একবার ফিরে তাকাবে। তারও যে ভালো লাগেনি তেমন নয়।

বাসারদা, আড় চোখে তাকাত, এমন কথা বলত যেন হিট ফ্লিমের ডাইলগ। অথচ আকার ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করত মেয়েদের সে পছন্দ করে না। গোলাপি কম কীসের। যেচে আলাপ করতে সে এক নম্বর, ফাইভ জি স্পিড। ওন লাইন পেয়ে ওকে একদিন ডাউনলোড করে ফেলে, এই যে দাদা, অমন রিয়ালিটি শোয়ের অ্যাঙ্কারের মতো তাকিয়ো নাতো। আমার অস্বস্তি লাগে, যা বলার হাই স্পিডে ক্লিক কর। না হলে খোদার কশম রিংটোন বদলে দেব।

ব্যাস, তারপর একদিন সন্ধ্যা বেলা ফারুকদের আমবাগানের ঈশান কোণে একা মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ডুমুর গাছের তলায় নিজের নিজের গৌরবগাথার ফোকাস থেকে বেরিয়ে আসে আই লাভ ইউ। শুরু হয় ফোর জি ডেটা। একদিনেই টু জিবি খতম। আবার রিচার্জ। সেই করে দেয় মিনিটের মধ্যে। অন লাইন ভিডিও চ্যাট। থ্রি ডি পিকচার সাথে থ্রি এক্স, ভিডিও চ্যাট, রাত্রি কাবার।

ব্যাস ঐ পর্যন্ত। সব অন লাইন। ফ্লাইং সেক্স।

তারপর বাসারদা উন্নততর প্রেমের সন্ধানে নিখোঁজ। অ্যানড্রয়েড ছেড়ে আই ফোনে চলে গেল। গোলাপি দৈব ঘটনা বলে বিচ্ছেদ মেনে নেয়। একদিন ব্লক করে দেয় নিজেই। তখন থেকে মূলত নতুন করে জন্ম হয় গোলাপির। পামেলা নামের অত্যাধুনিকা হারিয়ে যায় স্মৃতির সমুদ্রে। আগে তার ওই বাবা মার দেয়া পামেলা নামে প্রফাইল ছিল। আনলিমিটেড বিচরণ করত সোসাল মিডিয়ায়। কয়েক হাজার বন্ধু। বেপরোয়া জীবন যাপনের জেদি পামেলার লেখাপড়া হবে না ভেবে ব্যবসাদার ছেলে দেখে স্কুল পার হতে না হতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেয় পরিবারের সকলে মিলে। পামেলাও না করেনি।

তবে বিয়ের পর পামেলা একেবারে পাল্টি খেয়ে যাবে এমনটা বিশ্বাসের কোনো জায়গা ছিল না। কিন্তু পাল্টি খেল। আর রাতারাতি হয়ে ওঠে গাঁইয়া মেয়ে। পামেলার গন্ধটুকু কোথাও রইল না তার শরীর ও মনের কোনো এক গোপনে লুকিয়ে চুরিয়ে। রইল না শহরের ছিটেফোঁটা চিহ্ন।

সে এখন গ্রামের মেয়ের মতো কথা বলে। আগ বাড়িয়ে আলাপ করে। ছাদে বড়ি দেয়, কাপড় মেলে, আমের সময় আমসত্ব শুকাতে দেয়। রান্না করে, সবজি কাটে,কী করে না সে। রাত এলে স্বামীর কোলে নিশ্চন্তে ঘুমায়। আর কাদের বিছানায় শুয়েই আদরে আদরে বেসামাল করে দেয় তাকে। আলাপিকে যারা আগে দেখেছে তাদের সেগুলো এখন ফেক মনে হয়। হোকগে তাতে তার কী আসে যায়।

আজকের দিনটা হঠাৎ মূল্যবান হয়ে ওঠে। শরীরের ঝিমুনি ফেলে সে ছুটে ছাদে যায়। বৃষ্টি থেমে এখন অন্য আকাশ। রোদ ঝলমলে চরাচর। মহামূল্যবান আলোর ঝরনাকে সঙ্গত করছে ওপাড়া থেকে ভেসে আসা কোলাহলের বিচিত্র শব্দধ্বনি। গোলাপি নিজের কানে শুনছে। একটু অন্যরকম একটু ভিন্ন স্বাদের, আজ অপ্রত্যাশিত এই অনুরণন। বিয়ের পর এই প্রথম সে আকাশের দিকে চোখ তুলল। এমন বহুমুখী আকাশ সে বহুদিন দেখেনি। এত রঙ এত আলো! এত মানুষের কণ্ঠস্বর এতদিন কোথায় ছিল। সে কি বধির ছিল এতদিন? অন্ধ হয়ে গেছিল? এই প্রশ্নটাই তাকে নিজের বিস্ময়ে ভেতরের কপাট খুলে আপনা আপনি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। স্কুলজীবনের ডানা দুখানি যা ব্যবহার না করার ফলে পালক খসে পড়েছিল আজ যেন পালকগুলি জেগে উঠছে। শূন্যতার নৈতিক নৈঃশব্দে এ কীসের শব্দবিস্ফোরণ যা তার মর্মে ঝঙ্কার তুলছে? চেতনাহীন আত্মমোহের মগ্নতা ভেঙে গোলাপির কৌতূহল বাড়ে।

সে এখন গ্রামের মেয়ের মতো কথা বলে। আগ বাড়িয়ে আলাপ করে। ছাদে বড়ি দেয়, কাপড় মেলে, আমের সময় আমসত্ব শুকাতে দেয়। রান্না করে, সবজি কাটে, কী করে না সে। রাত এলে স্বামীর কোলে নিশ্চন্তে ঘুমায়। আর কাদের বিছানায় শুয়েই আদরে আদরে বেসামাল করে দেয় তাকে। আলাপিকে যারা আগে দেখেছে তাদের সেগুলো এখন ফেক মনে হয়। হোকগে তাতে তার কী আসে যায়।

বহুদিন বহুকাল সে বাইরের কোলাহল শোনেনি। বাইরের পৃথিবীর কতটা বদল ঘটেছে জানে না সে। তাদের বাড়ির পাশে ফাঁকা পতিত জমিগুলো যেগুলো সে নতুন বউ হয়ে আসার পর দেখেছিল, সেগুলো এখন ঢাকা পড়ে গেছে অত্যাধুনিক দালান বাড়ির ইমারতে। আজই সে চারপাশ চোখ মেলে তাকাল। অথচ নিয়মিত সে ছাদে আসে, কাজ সেরে ফিরে আসে ঘরে। তাকাবার ফুরসত মেলেনি। চব্বিশ ঘণ্টা তো সংসার আর কাদের। ওদের ভালোবাসার প্রেমান্ধকারে পৃথিবী অত্যন্ত তুচ্ছ। এইভাবে অনেকটা সময় অতীত হয়ে গেছে গোলাপি টের পায়নি। ছাদের শূন্যতায় আছড়ে পড়া কোলাহল তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে তার প্রিয় অতীত। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি তার প্রেম দিয়ে বানানো কলাই বড়ি ভিজিয়ে দিয়েছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। এখন এই ভেসে আসা কোলাহলে মানুষের প্রাণচঞ্চল ন্যায় অন্যায়, বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত যাই হোক না কেন তার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিচ্ছে। জীবনের ভিতরে যে জীবন- ফিরে পাচ্ছে। যে সময় মোহ অন্ধকারে কেটেছে, সংসারে অবাঞ্ছিত পাওয়াগুলো অনিবার্য ভেবে মানসিক নির্যাতন সরিয়ে খুশি থেকেছে। অন্যদের এমনকি নিজেকেও জানতে দেয়নি আজ চিৎকার করে জানাতে ইচ্ছে করে, বেঁচে আছে সে। তারপর সে সত্যি সত্যিই চিৎকার করে ওঠে, এই তোমরা শুনতে পাচ্ছ? একটু অপেক্ষা কর, আমিও আসছি...

নাচতে নাচতে গোটা ছাদময় তার পায়ের ছন্দ কেঁপে কেঁপে উঠল। নীচ থেকে ছুটে এল বাড়ির লোকজন। কী হলো! কী হলো! কী হয়েছে বউ মা?

এ যেন সেই কিশোরী পামেলা। তার কানে কোনো কথা গেল না। সে কণ্ঠস্বরের উঠা নামা অথবা চড়া লয়ে জানান দিল, ‘মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ’। দ্রুতগতিতে ছাদ থেকে নেমে আসে। তার পেছন পেছনে ঘরের সদস্যরা ছোটে। খবর দে খবর দে কাদের কে।

সে আছে বাজারে তার দোকানে। ততক্ষণে সদর দরজা খুলে গোলাপি যেখান থেকে কোলাহল আসছে সেখানে ছুটল। সে আর কতটুকু? সেখানে চলছিল সরকারি প্রকল্পের ফর্ম দেয়া ও আবেদন জানানোর লাইন। শুধু মেয়েদের জন্য সরকার মাসিক হাজার টাকা দেবে যাতে তারা স্বাধীন ভাবে ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারে। তাই মেয়েদের লম্বা লাইন। চলছে চিৎকার চেঁচামেচি, হই চই কলরব। বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল গোলাপি। এত এত মেয়ে! এরা সব এতদিন কোথায় ছিল? সে দেখতে পায় হাজার হাজার ওইসব মেয়েদের চোখের অভিব্যক্তি কত বিচিত্র রঙের। গোটা আকাশ নেচে উঠছে তাদের উচ্ছল চঞ্চলতায়। যেন তারা মুক্তির ডানা মেলেছে।

একধারে অনেকগুলো যুবক মেয়েদের ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছে। কেউ মুখে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে। গোলাপি কিছুক্ষণ সময় নিল। এত মেয়ে মানুষ একসঙ্গে দেখেনি গোলাপি। তাদের প্রাণচঞ্চল গতিস্রোতের এতটাই টান যে গোলাপি উড়তে

উড়তে এগিয়ে গেল লাইনের দিকে আর লাইনে দাঁড়ানো শেষের মেয়েটির পেছনে গিয়ে থামল।

হুড়োহুড়ি চলছিল। এক এক করে এগিয়েও যাচ্ছে। গোলাপি এগিয়ে যায়। এত ভিড়! কীসের টানে এত মেয়েমানুষ! শুধু কি টাকা? না দীর্ঘদিনের অধীনস্থ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম সোপান? নিজের ভেতরে ঢুকতে চায় সে। পামেলা একটি আংশিক স্বাধীন সত্তা যেখানে মা বাবা শাসন ও প্রশ্রয় মিশে ছিল। ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি সবার সাথে মেলা মেশার সুযোগ ছিল। বকুনি হয়তো খেতে হতো কিন্তু সে আর কতক্ষণ। সে আর কতদিন। এক সময় মধ্যবিত্ত বাবার প্রশ্রয় ছেড়ে তাদের আদেশ মাথা পেতে নেয় পামেলা। এই মেনে নেয়ার মধ্যে কোনো মিথ্যাচার ছিল না। শ্বশুর বাড়িটি প্রথম দিনটি থেকে কেমন করে নিজের হয়ে গেছে তা সে জানে না।

> গোলাপির শরীরে তখনও ক্লান্তি জড়িয়ে রয়েছে। আর এখন দরজায় ধাক্কা খেয়ে তার কপাল কেটে রক্ত বের হচ্ছে; তবুও সে উঠে দাঁড়ায়, বুঝতে পারে না কী তার অপরাধ। বুঝে কাজও নেই। আজ সে সব আগল ভেঙে বেরিয়ে যাবে। কোনো বাধা সে মানবে না। তার চলবার জন্য নিজস্ব দুখানা পা, কাজ করার জন্য দুখানা হাত,আর উড়বার রয়েছে দুখানা ডানা যা সে আগে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি জীবনের স্রোতে যে নৌকাটায় সে এতদিন পাড়ি দিয়েছে সেটা নিজের ছিল না।

আজ এই লাইনে দাঁড়াতে আসা মেয়েদের সাথে যোগ দেয়া পূর্ব পরিকল্পনা নয়। আমচকা তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মতো এটা একটা রহস্য। নদী ভাঙনের মতো মহান জীবনের ভাঙনও স্বাভাবিক। এইসব অতিদার্শনিক উপলব্ধি তার হৃদয় আত্মাকে আলোকোজ্জ্বল এক শূন্যতার স্পর্শকাতরতায় পৌঁছে দেয়। সে তখন লাইনে পা ফেলা শেষ করে ফর্ম বিতরণের টেবিলটির সম্মুখে দাঁড়ায়। ফর্ম হাতে কর্মরত যে যুবকটি এগিয়ে আসে গোলাপির হাতের নাগালে, উচ্ছাস আবেগে তার মুখোমণ্ডল আলোকিত হয়ে ওঠে, হাই পমি, তুমি এখানে? মানে...!

গোলাপির দৃষ্টি যায় সেদিকে। বুঝতে পারে যুবকটি একসঙ্গে বহু কথা বলতে গিয়ে নির্বাক হয়ে গেছে। সে তাকে চিনতে পারে। ফেসবুকে আলাপ। তারপর ইন বক্স দিয়ে

অনেকটা পথ হেঁটেছিল। পমি নামটা তারই দেয়া। সে একজন কবিও বটে। তাকে নিয়ে কত যে কবিতা। তখন একবারও মনে আসেনি বিয়ে শব্দটা। এলে কী হতো তাও সে জানে না।

এই নাও ফর্ম। তোমার বুঝি এখানেই বিয়ে হয়েছে।

হ্যাঁ, ফর্মটা দেখতে থাকে পমি। পরে বলে কী করতে হবে?

কিছু না। কেবল নাম ঠিকানা আধার কার্ডএর জেরক্স আর...

তারপর কী বলল তার কানে গেল না। পেছন থেকে কাদের তার হাত ধরে জোরে টান মারল। সে টলমল। সমলাতে না পেরে কাদেরের শরীরে ধাক্কা মারে। কাদের ভীষণ জোরে ধমকে উঠল, কী করছিস? তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল বাড়ির পথ ধরে। গোলাপি বুঝতে পারল না হঠাৎ এমন কেন ঘটল। সে তার ইচ্ছা অনিচ্ছা অথবা প্রতিবাদ করল না। এক মহাশূন্যতার তন্ময়তার মধ্যে তাকে ঠেলে নিয়ে চলল কাদের। পেছনে শুধু লাইনের দিকে দৃষ্টি ফেলে অনুভব করল কয়েক লক্ষ মেয়ে তারা তাদের নিজের পায়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এক অতিমানবীয় শক্তির আলোকোজ্জ্বল বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করল সে। আরও লক্ষ্য করল লাইনে দাঁড়ানো সব মেয়েদের দুই হাত আর হাত নয়, মস্ত বড় বড় দুটো ডানাও যুক্ত হয়েছে। আশ্চর্য তারা এখন ইচ্ছে মতো উড়তে পারবে।

এই ডানা, এই পা দু'খানি তার ছিল না। কেন ছিল না তা সে জানে না। জলের মতো যে পাত্রে যে কেউ ঢেলেছে সেই পাত্রের আকার ধারণ করেছে। এখন তার কণ্ঠে জোরালো স্বর বের হল, দাঁড়াও শেষ পর্যন্ত জানা হল না যে কী করতে হবে। ফরমটা ভর্তি করব কেমন করে।

কাদের কোনো কথা না শুনে তাকে শরীরের সব শক্তি দিয়ে টেনে নিয়ে চলে বাড়ির পথে। দরজায় দাঁড়িয়ে পরিবারের মেয়েরা। তাদের বিভিন্ন জনের কটূক্তি আর ক্রোধের সামনে কাদের ভলিবলের মতো ছুড়ে দিল গোলাপিকে। ওরা তাকে ঘিরে সিরিয়াল সংলাপে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। কাদেরও হুঙ্কার ছাড়ে, লজ্জা করে না তোর, এক হাজার টাকার জন্যে বাড়ির মান ইজ্জত ধুয়ে দিলি। টাকার এতই যদি দরকার ছিল আমাকে বললি না কেন। আমি কি তোকে টাকা দিই নি কোনোদিন?

গোলাপির শরীরে তখনও ক্লান্তি জড়িয়ে রয়েছে। আর এখন দরজায় ধাক্কা খেয়ে তার কপাল কেটে রক্ত বের হচ্ছে; তবুও সে উঠে দাঁড়ায়, বুঝতে পারে না কী তার অপরাধ। বুঝে কাজও নেই। আজ সে সব আগল ভেঙে বেরিয়ে যাবে। কোনো বাধা সে মানবে না। তার চলবার জন্য নিজস্ব দুখানা পা, কাজ করার জন্য দুখানা হাত,আর উড়বার রয়েছে দুখানা ডানা যা সে আগে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি জীবনের স্রোতে যে নৌকাটায় সে এতদিন পাড়ি দিয়েছে সেটা নিজের ছিল না।

গ ল্প

সর্বানী বেগম

পরিযায়ী

লেবাররা ঠেলাঠেলি করে হেলে পড়া ট্রান্সফরমারটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। মেরামতির কাজ অনেকখানি বাকি। সুপারভাইজার নজরুল ছায়ার খোঁজে পাকারাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেল। বেশ ঝাঁকড়া শিরীষগাছ। আম্ফান আর কালবৈশাখীর ঝাপটা সামলে এখনো খাড়া হয়ে আছে এটাই আশ্চর্য। বড় যুদ্ধ জিতেছে সে। গাছতলায় ফাড়া বাঁশের টুকরো ইতস্তত পড়ে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দেখে বোঝাযায় এখানে নিশ্চয় বাঁশের মাচা ছিল। গ্রামের ছেলে-বুড়ো আড্ডা দেওয়ার জায়গা। একটু দূরেই ঝাঁপবন্ধ চায়ের দোকান। নজরুল পা দিয়ে আবর্জনা সরিয়ে গাছের গোড়ায় বসে পড়ল উবু হয়ে। এই ক'দিন ধকল যাচ্ছে। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। আম্ফানের দাপটে সর্বত্র ইলেক্ট্রিকের পোস্ট পড়েছে, প্রচুর তার ছিঁড়েছে। ছুটে ছুটে নজরদারি করতে হচ্ছে। কাজের চাপে ঘুম হচ্ছে না ঠিকঠাক। মেজাজটাও বিগড়ে যাচ্ছে সহজেই। এই এলাকায় আজ লাইন দিতেই হবে। মন্ত্রী মশায়ের আব্দার। আব্দার না বলে হুকুম বলাই ভালো। গ্রামের লোকে বিক্ষোভ করেছিল। মন্ত্রী মশাই সাইরেন বাজিয়ে এসে কথা দিয়েগেছেন। সামনে ভোট। স্বয়ং মন্ত্রী মশাই বেশ চাপে আছেন। তবে তিনিতো দোষারোপ করেই খালাস। যত দোষ নন্দঘোষ ইলেকট্রনিক সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট। লোকের প্যাঁদানিও খাবো, কাজও করব, গাধার খাটুনিও খাটব! লেবারগুলো খাটছে প্রাণ বাজি রেখে। কে ভাবে আমাদের কথা! এসব কথা ভাবতে ভাবতে কপালের ঘাম মোছে নজরুল। ভেজাগেঞ্জির ভিতর ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে উবু হয়ে কতক্ষণ বসা যায়। তাই প্লাসটিকের জুতো জোড়া পেতে আরাম করে বসে। গাছের গায়ে চোখ পড়তেই দেখে মাটি ফুঁড়ে পিঁপড়ে উঠে লাইন ধরে চলেছে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে। আবার বৃষ্টি হবে। তা হোক। যা গরম পড়েছে! এ হল জৈষ্ঠ্যের আম-কাঁঠাল পাকাবার গরম। একটা বিড়ি ধরায় নজরুল। তামান্না অনেক বকাবকি করলেও এই নেশাটা কিছুতেই ছাড়তে পারেনি সে। এতক্ষণ পর চার পাশে খেয়াল

করে দেখল কতকগুলো পাখির বাসার ধ্বংসাবশেষ ছিঁড়ে-খুড়ে পড়ে আছে ইতি-উতি। আর বিশ্রামের অবকাশ রইল না। একজন লেবার এসে ডেকে নিয়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে রওনা দিল নজরুল ট্রান্সফরমারের কাছে।

রাত আটটায় বাড়ি ফিরে গোসল করে এক কাপ চা খেয়েই তন্দ্রায় ঢুলছিল সে। সচেতন হল তামান্নার ডাকে। ন'টা বাজে। "ভাত বাড়ছি" বলে ডেকে গেল তামান্না। খাওয়া শেষ করে আব্বার ঘরে গেল নজরুল। প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছে আজ একটা বছর। কথা বললে কান খাড়া করে শুনতে হয়। না হলে ঠিক ঠিক বোঝাযায় না কী বলছে। অবশ্য বাড়ির সবার অভ্যাস হয়ে গেছে। সবাই বুঝতে পারে এখন। গুঙিয়ে গুঙিয়ে আব্বা বলে, ফুপুর বাড়ি আম-কাঁঠাল দিয়ে আসতে। আব্বা জানে কাল রবিবার, ছুটির দিন। নজরুল বলতে যাচ্ছিল এখন আর শনি-রবি নেই, সব দিনই কাজ। সে কথা বলা হয় না। খাটের উপরে আব্বার পাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে মা। মা চোখ টিপে ছেলেকে সতর্ক করে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলে ওঠে, "আমি বলে দিয়েছি, দিয়ে আসবে। চিন্তা কোরো না।" আব্বার ঘর থেকে বিদায় নেয় নজরুল। নিজে নড়তে-চড়তে পারে না, কিন্তু দু'বেলা তার ফুপুর খোঁজ নেওয়া চাই। ছোটবেলা

> গুনে শেষ করা যাবে না, এত মানুষের ভীড়। এই দুনিয়ায় আর কি কখনো শান্তি ফিরবে? দু'হাত তুলে মোনাজাত করে সে গোটা দুনিয়ার মানুষের জন্যে। বিশেষ করে ওই সব মানুষগুলোর জন্য যারা পেটের দায়ে বিভুঁই হয়েছিল। কাজ বন্ধ, খাওয়া বন্ধ, তাই তারা ফিরতে চায় নিজ গাঁয়ে, নিজ শহরে। কিন্তু কে তাদের ফেরাবে? লক-ডাউন ঘোষণার আগে সরকার কি তাদের কথা ভেবেছিল? বেঘোরে আঁটকা পড়ে গেল ওরা। কুকুরের মত খাবার কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে তেমন ভিডিও দেখেছে সে সোশ্যালসাইটে। কোলের শিশু কোলেই মরে গেছে! বুকচেরা মায়ের হাহাকার দেখে কেঁদে ফেলেছিল তামান্না। বুকে টেনে তাকে শান্ত করেছে।

বাপ হারিয়েছিল আব্বা। ফুপুকে বাপের আদর দিয়ে মানুষ করেছিল। লক-ডাউন তাতে কী! এরমধ্যেই দু-বার মোটরসাইকেল চড়ে বড় ভাইকে দেখে গেছে। সকাল-সন্ধ্যে মায়ের সঙ্গে ফোনাফোনি চলছে।

খাটের উপর আরাম করে বসে পেপার দেখছিল নজরুল। চোখ আঁটকে গেল একটা খবরে। হায়দ্রাবাদ থেকে হেঁটে বীরভূমে আসছিল। দাদা ইয়ার মহম্মদ আর শেখ আলমগীর। তারা দুজনেই রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। পথে সারাদিন পানি খেত আর রাতে একটা কলা ও পাঁউরুটি। পথে ভাত খায়নি তারা। মাঝে মাঝে ট্রাক বা বাসে করে এসেছে কিছু পথ। কেউ পঞ্চাশ, কেউ একশো নিয়েছে। কেউবা কিছুই নেয়নি। ওড়িশার বালাসোরের কাছে এসে খুব বৃষ্টি পেয়েছিল। ট্রাক থেকে নেমে একটা গ্যারেজে শুতে যায়। একটা পাঁউরুটি ছিল, ভাগ করে খেয়েছিল ওরা। সকালে ডাকাডাকি করে দেখা গেল দাদা আর উঠছে না। পুলিশ এল, সাংবাদিক এল, বডি নিয়ে গিয়ে পোস্টমর্টেম হল। হাতে কোনো রিপোর্ট পায়নি আলমগীর। মুখে শুধু তাকে জানানো হয়েছে হার্টের অসুখে মরেছে। না খেয়ে মরেনি। আলমগীরের বক্তব্য, তারাতো এক সাথেই থাকত আর এতটা পথ এল। রাস্তায় একবারও তো বলেনি বুকে ব্যথা করছে। কেবল বলত, "ঘরটা কবে যাব?" ঘরে তার যাওয়া হল না।

খবরটা পড়ে মনটা উদাস হয়ে গেল নজরুলের। মনে মনে বলল, "জান্নাত নসিব হোক লোকটার।" বিড়ি খেলে কী হয়, নজরুল ধার্মিক পুরুষ। সারাদিনের কাজা নামাজ সে একবারে পড়ে নেয়। সালাম ফেরাতে গিয়ে আজ দু' কাঁধে দুই ফেরেস্তার বদলে ইয়ার মহম্মদ আর আলমগীরকে দেখতে পায়। বাস্তব চর্মচক্ষুতে যাদের সে কোনোদিন দেখেইনি। এমন কি পেপারেও তাদের ছবি দেয়নি। গা কেঁপে যায় নজরুলের। দোয়া করতে করতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। "হে আল্লাহ! বালা-মুসিবত থেকে দূরে রাখো আমার পরিবারকে। সারা জাহান থেকে এই রোগ দূর করো।" পেপারে দেখা ছবি আর খবরগুলো সার বেঁধে চলে আসে চোখের সামনে। নতুন একটা শব্দ আমদানি হয়েছে, "পরিযায়ী শ্রমিক।" হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছে তারা কত রকম বাধা বিপত্তি পেরিয়ে। কত জা'ন শেষ হয়ে যাচ্ছে বিপাকে। রেল লাইনে ঘুমিয়ে পড়ে রেলে কাটা পড়ছে, না খেতে পেয়ে মরছে, হাঁটার ধকল সইতে না পেরে মরছে। বাড়ি ফেরার তাড়নায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পথে নেমেছে। কিছুদিন আগে পেপারে দেখেছে নজরুল, পুলিশের তাড়া খেয়ে জুতো হারিয়ে খালি জলের বোতল চেপ্টে পায়ে বেঁধে হাঁটছে। একটা চ্যানেলে রিপোর্ট করেছে, হাইওয়েতে উঠতে দিচ্ছে না পুলিশ। কাঁচা পথে, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে পাড়ি দিয়েছে মজদুররা। সরকার ট্রেন দিচ্ছে মজুরদের বাড়ি ফেরাতে, এমন গুজব শুনে মজুররা জমা হয়েছিল মুম্বাইয়ের বান্দ্রা স্টেশনে, সেই ছবি দেখেছে নজরুল। শুধু মাথা আর মাথা! গুনে শেষ করা যাবে না, এত মানুষের ভীড়। এই

দুনিয়ায় আর কি কখনো শান্তি ফিরবে? দু'হাত তুলে মোনাজাত করে সে গোটা দুনিয়ার মানুষের জন্যে। বিশেষ করে ওই সব মানুষগুলোর জন্য যারা পেটের দায়ে বিভুঁই হয়েছিল। কাজ বন্ধ, খাওয়া বন্ধ, তাই তারা ফিরতে চায় নিজ গাঁয়ে, নিজ শহরে। কিন্তু কে তাদের ফেরাবে? লক-ডাউন ঘোষণার আগে সরকার কি তাদের কথা ভেবেছিল? বেঘোরে আঁটকা পড়ে গেল ওরা। কুকুরের মত খাবার কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে তেমন ভিডিও দেখেছে সে সোশ্যালসাইটে। কোলের শিশু কোলেই মরে গেছে! বুকচেরা মায়ের হাহাকার দেখে কেঁদে ফেলেছিল তামান্না। বুকে টেনে তাকে শান্ত করেছে।

রাতে শুয়েও সহজে ঘুম আসে না নজরুলের চোখে। কাল বেরোতে হবে। কাজের চিন্তা মাথায় ঘোরে। সেই চিন্তাকেও ছাপিয়ে যায় ওই সব মানুষগুলোর কথা মনে হলে। সে চিন্তা করে তার চাচাতো ভাই আতিয়ার যদি লক-ডাউনের আগে বাড়ি না ফিরত কী হত তার! আতিয়ার হায়দ্রাবাদে বোরখার কারখানায় কাজ করত। আবার কি যেতে পারবে সে? এই যে লোকগুলো ফিরে আসছে, ফিরে এসে কি করবে ওরা? কতদিন বসে থাকবে? বসে খেলে রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়, আর ওরা তো নিতান্তই খেটে খাওয়া মানুষ। ফিরেও তো শান্তি নেই। ওরা এখন অচ্ছুত গ্রামের লোকের বাধায় কেউ ঘর বন্দী, কেউ আশ্রয় নিয়েছে কোয়্যারান্টিন সেন্টারে, কেউবা কিছু তোয়াক্কা না করে দেদার ঘুরছে এলাকায়। কেমন একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চারদিকে। কাজের চাপে মানসিক চাপ যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আগের মতন তেমন গভীর ঘুম আসে না। মাস পাঁচেক হয়েছে বিয়ে হয়েছে। অথচ তামান্নার সঙ্গে সময় কাটানো যাচ্ছে না কিছুতেই। ছুটির দিনও ডিউটি করতে হচ্ছে। পাশে ঘুমন্ত তামান্নার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিই ব্যাঙ্গের হাসি হাসল নজরুল। সে নিজেই এখন পরিযায়ী হয়ে গেছে। বাড়িতে তার থাকার ফুরসত নেই তো বউকে সোহাগ করা বহুত দূর। একটা চাপা দম ছেড়ে পাশ ফিরে শুলো নজরুল। হঠাৎ করে দার্শনিক হয়ে উঠল যেন। সকালের দৃশ্যটা মনে ভেসে উঠল আবার। গাছ বেয়ে পিঁপড়ে উঠছে। বাসা ছেড়ে চলেছে সুরক্ষিত স্থানে। পাশাপাশি ভেসে উঠল আর একটা দৃশ্য, রাস্তায় দলবেঁধে মানুষ হাঁটছে। সাইকেল চালাচ্ছে কেউ। উঠে বসল নজরুল। ঘুমাতেই হবে। রোদের তাপে ঘুরতে হবে। শরীর সুস্থ রাখা দরকার। কিছুদিন ধরেই ঘুম হচ্ছিল না। তাই ফেরার পথে ডাক্তাকে দেখিয়ে এসেছে। ডাক্তারের দেওয়া হালকা ডোজের ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল। ঘোরের মধ্যে সে যেন দেখতে পেল, আদম আর হাওয়াকে জান্নাত থেকে ফেলে দেওয়া হল দুনিয়ায়। আল্লাহ বলছেন, "আজ থেকে তোমরা পরিযায়ী।" কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একদল মানুষ জানাজা পড়ছে। চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে মানুষের রব, "এই দুনিয়ায় আমরা পরিযায়ী আমরা পরিযায়ী, আমরা পরিযায়ী...." ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে গেল নজরুল।

বঙ্গ - দর্পণ

বিকাশকান্তি মিদ্যা

শৈশবের পাঁচালি

।। জলের পোকা জলে যা ।।

স্কুলে যাওয়ার নাম শুনলেই কান্না আমার থামায় কে?

তার একটা কারণ যদি হয় মা'কে ছেড়ে থাকার চিন্তা, তো আর একটা সেজদার দেখানো ভয়।

অত সাত সকালে তো 'অ্যাডমিশান' শব্দটা জানতাম না, জানতাম 'ভর্তি'। আর ওই শব্দটা নিয়েই গল্প বানাতো সেজদা। বলতো, হেডমাস্টার শরৎবাবু বড়ো একটা বাক্স নিয়ে বসে থাকেন, কোনো বাচ্চা স্কুলে ভর্তি হতে গেলে, সেই বাক্সের মধ্যে পুরে তালা বন্ধ করে দেন, একে বলে ভর্তি।

ভর্তির এই প্রক্রিয়া শুনে কার আর সাধ হয় স্কুলে যাওয়ার? তার চেয়ে ঘুরেফিরে মায়ের আঁচল চেবানোর মজা বুঝি অনেক।

একটা থেকে দুটো তালা-ই ছিল না ঘরে, তবু মায়ের আঁচলের এক কোণে ঝুলতো চাবির একটা গোছা—এটাই বুঝি গার্হস্থ্যের চল—অন্য কোণে আমি। শুকনো কাপড়ের ওই কোণটাতে কী যে থাকতো শৈশব-ই বোঝে, সারাক্ষণ কেবল মুখে গোজা আমার, চেবানো সারাক্ষণ।

মা বলতো, দাদা-দিদিরা সব ইস্কুলে যাচ্ছে, তুই সারাদিন আঁচল চিবিয়ে যাবি? ইস্কুলে না গেলে এবার ভাত বন্ধ হবে।

সানোদা বলতো, ইস্কুলে না গেলে ছবিও পাবি না, পুতুল তো নয়ই।

ছোট ভাই বলে কথা, দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সানোদার দায় ছিল সাদা খাতার একটা করে পাতায় আমার ফরমাশ মতো ছবি এঁকে দেওয়া।

খেতে বসে পছন্দের জিনিষ রোজ যে মিলতো তা নয়, তখনই শুরু হতো কান্না, না খাওয়ার। তখন স্বরচিত নানান রকমারি সুরে আবোল-তাবোল গান আর গল্পে ভোলাতো

সানোদা। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরাও থাকতো তাতে। একটা গান ছিল এমন, 'ব্যাঙ ধরে চ্যাং, আর চ্যাং ধরে ব্যাঙ, নাচো গনাইয়ের বাপ গামছা মুড়ি দিয়ে।'

কিন্তু প্রতিবার যে গনাইয়ের বাপ নাচলেই মুখ বন্ধ করে খেয়ে নিতে হবে, এমন কথা দিতে পারতাম না, নগদ নগদ ছবি আর মাটির পুতুলের প্রতিশ্রুতি পেলে, তারপর খাওয়া।

প্রতিশ্রুতি ফাঁপা নয়। এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ ছিল সানোদার হাত। ছবি তো আঁকতোই, নারকেলের কাঠি দিয়ে মাটির সুন্দর সুন্দর পুতুল বানাতো। সে আর দিদির পুতুল খেলার বর-কনে নয়। রীতিমতো মাথা নাড়ে, হাত ঘোরায় আর যুদ্ধ করে সৈনিকের মতো।

সেই সব সৈনিকের পাশে এসে গেল সরস্বতী।

তালপাতার পাততাড়ি বানিয়ে দিল বাবা। তার উপর ছুরির পিছন দিয়ে সানোদা দিল খোদাই করে, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, আর ১-১০ সংখ্যা। আমার কাজ হলো বোলানো। কঞ্চির কলম, কাঠ কয়লার কালি। সুলেখা কালির পুরানো আধার দিয়ে বানানো হলো দোয়াত।

পোড়া কাঠকয়লা শিলে ফেলে গুড়ো করে দোয়াতে ঢেলে জল দিয়ে বুড়োমা বানিয়ে দিত কালি। তাতে কঞ্চির কলম চুবিয়ে তালপাতায় খুদে দেওয়া বর্ণ উচ্চারণ করে করে বোলানো হতো আমার কাজ। এ সময় যার কালি যত ঘন হতো আমাদের ওই তালপাতার 'ভুর্জপত্র'-এ তার লেখা তত স্পষ্ট হতো। কালি ঘন করার জন্যে ছিল একটা ছড়া। 'কালি ঘাঁটি কালি ঘাঁটি সরস্বতীর পা'য়/ যার দোয়াতে ঘন কালি আমার দোয়াতে আয়।'—শ্বেতবরণী, শুভ্রবসনা সরস্বতীর পায়ে ওই কাঠ কয়লার কালি সত্যি সত্যি যদি মাখানো হতো, তিনি কতটা তুষ্ট হতেন বলতে পারি না। তবে সমবয়সী আমরা দলবদ্ধ হয়ে যখন পড়তে বসতাম চন্ডীমন্ডপের বারান্দায়, পাশে পাততাড়ি রেখে, কালির দোয়াত কোলে ধরে, কঞ্চির কলম দিয়ে কালি ঘাঁটতে ঘাঁটতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ছড়াটা যখন উচ্চারণ করতাম, কালি ঘন হওয়ার বিশ্বাসে বেশ আত্মতুষ্টি অনুভব করতাম তখন।

প্রতিশ্রুতি ফাঁপা নয়। এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ ছিল সানোদার হাত। ছবি তো আঁকতোই, নারকেলের কাঠি দিয়ে মাটির সুন্দর সুন্দর পুতুল বানাতো। সে আর দিদির পুতুল খেলার বর-কনে নয়। রীতিমতো মাথা নাড়ে, হাত ঘোরায় আর যুদ্ধ করে সৈনিকের মতো।

সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসে শ্লেটে হল হাতে খড়ি। শুরু হলো স্কুল যাওয়া।

ভর্তির কোনো বাঁধা দিনক্ষণ নেই, তবু ভর্তির দিনটাতে স্কুলের রাস্তা যেন না ফুরালেই বাঁচি। কিন্তু সাত মিনিটের রাস্তা, কত আর দীর্ঘ করা যায়?

স্কুল মাঠ অপরিচিত নয়। কালীপুজোর মেলা হয় এখানে। খাওয়ার জলের ডিপ টিউবওয়েল স্কুলের মাঠে। মা দিদি খাওয়ার জল নিতে আসে এখানে, সে সূত্রে গাববেড়িয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চেনা জায়গা। কিন্তু সে বাইরে বাইরে। ভিতরে তো ঢুকি নি, তাই ...।

ভিতর কি আর ছিল নাকি? দরজাগুলো কোনো ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও, জানালার অর্ধেক ভাঙা। সেই ভাঙা জানালা দিয়ে ভর্তির বাক্সটা পালিয়ে গেছে নাকি, হেড মাস্টার শরৎবাবু সামনের কাঠের আলমারি থেকে একটা খাতা বের করলেন। তাতেই নাম আর বয়সটা লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বাচ্চাদের দিকে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল! সমবয়সী বাচ্চা দেখে সাহস হলো, আর বাক্স যখন নেই, মনে হলো আসা যায়।

পরদিন সেজদাই নিয়ে এলো। সঙ্গে শ্লেট, পেন্সিল, একটা আদর্শ লিপি আর চটের উপর বোনা আসন।

কিন্তু আসন তো আনা হলো, জায়গা কোথায় যে পাতবো? এখনকার লোকাল ট্রেনের ভীড়ের মতো পরিস্থিতি। এত সব ভয়-ডরলেশ বিদ্যার্থী, আর আমি কিনা ঘরে বসে ভাবি? আমার মতো রোগা পাতলা দুর্বল কেউ কেউ আছে বটে, তবে ষণ্ডাই বেশি। তারা নিজেরা তো বসেছে, এখনও না পৌঁছানো সঙ্গীর জন্যে জায়গাও রেখেছে। কী তাদের হম্বিতম্বি! আসন পাততে তো দেবে না, বসার জায়গায় ছোঁয়া লাগলেও মারতে উদ্যত। যেন এক একটা মহিষাসুর!

সেজদা যতক্ষণ ছিল, একরকম, চলে যেতেই এরকম মহিষাসুর কয়েকজন মিলে রাজত্ব করতে শুরু করলো, এখানে বসা যাবে না, ওখানেও না, অন্য জায়গায় তো নয়-ই। কেঁদে ফেলার উপক্রম। মায়ের উপর রাগ হচ্ছিল খুব, দাদাদের উপরও। মনে হচ্ছিল, বাড়ি নয়, পালিয়ে যাই কোথাও। এই জন্যেই আমি আসতে চাইনি।

অভিমানে গৃহত্যাগের ভাবনাটা দানা বাঁধবে কী, মোটর সাইকেলের আওয়াজে সাড়া পড়ে গেল মাঠে। সবাই ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরলো গাড়ি। মোটর সাইকেল না, এমন ভাবে ঘিরে দেখছিল সবাই, যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসা কোনো যান!

যান থেকে যিনি নামলেন, পরনে ধুতি, বুশ শার্ট, মাথায় মোটা একগোছা টিকি। সঙ্গে দু'টি ছেলে—গোকবিহারী, রাসবিহারী। বুঝলাম প্রফুল্ল মাস্টার। বুড়োমা-ই এনার কথা বলে। প্রতিটা নাতি-নাতনিকে স্কুলে পাঠানোর পর এই মাস্টারের কাছে বলে যেত

বুড়ি, মাস্টার, মাসটা তোমার, হাড় আমার। হাড় থাকলে মাস গজাবে। পড়া-লেখাটা যেন হয়।—কথাটা মনে পড়তেই গা হিম হওয়ার অবস্থা।

তবে হিমায়ন শুরু হয় স্কুল আরম্ভ হলে। একটা টুলের উপর বসে, থামে মাথা হেলানো। জায়গাটা তৈলাক্ত হয়ে গেছে তাঁর ঘানি ভাঙা তেলের দাগে। হাতে লম্বা ছড়ি। যথাসাধ্য স্থানচ্যুত না হয়ে দূরতম বাচ্চাটাকেও যাতে ভুল-ত্রুটি শোধন করা যায় বেত্রযোগে তার ব্যবস্থা প্রফুল্লবাবুর।

বেত্রযোগ তো ছিল-ই, হাত মুখও বাদ যেত না। বানান বা পড়া ধরার সঙ্গে সঙ্গে শ্লেটে লেখা দেখানোর রেওয়াজও তাঁর। সমস্ত কাজ ওই নির্দিষ্ট টুলে বসেই তিনি সমাধা করতেন। ছাত্র-ছাত্রীদের নাম বাঁকিয়ে ছড়া কাটায় প্রফুল্লবাবু বেশ দক্ষ। পড়া না পারলে, অপরাধী ছাত্রকে প্রফুল্লবাবুর সামনে এসে হাত পাততে হতো, তিনি যথেষ্ট পরিমাণ গায়ের জোর উপহার দিয়ে জায়গায় পাঠিয়ে দিতেন। লেখা ভুল বা খারাপ হলে শ্লেটের পাখা গজিয়ে ছাড়তেন প্রফুল্লবাবু। পড়া ধরার জন্যে যে বইটা নিতেন, তারও। শ্লেট কিংবা বই উড়ে গিয়ে পড়তো স্কুলের মাঠে। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীরাও উড়ন্ত শ্লেটের লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হোত না। ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতটা হয়তো হতো না, কিন্তু নামের বিকার বা বই-শ্লেট ছোঁড়ার হাত থেকে রেহাই পেত না তারা।

পাততাড়ির কালি মোছার মতো শ্লেটের কালি মোছারও একটা ন্যাকড়া থাকতো সবার কাছে। এর মধ্যে ন্যাকড়ার পরিবর্তে কেউ কেউ সাইকেলের সিট থেকে স্পঞ্জের একটু টুকরো নিয়ে আসতো। সে তখন ক্লাসের হিরো। সবার চেষ্টা তখন স্পঞ্জের টুকরোটাতে একবার হাত দিয়ে দেখা। আর মালিককে হাত করা। তার সঙ্গে ভাব করার কী হুড়োহুড়ি! স্পঞ্জের মালিক যেন ক্লাসের সম্পদ। তার হাঁটা-চলায় গলাফোলানো পায়রার গর্ব।

স্পঞ্জ পেতো না যারা বা ন্যাকড়া আনতে ভুল করতো যারা, তারা তখন বিকল্প শ্লেট-মোছা আবিষ্কারে ব্যস্ত।

স্কুলের মাঠ পেরিয়ে ছিল স্কুলের পুকুর। বিশাল পুকুরটা অযত্নের উদাহরণ হয়ে সব সময় বিশাল বিশাল কচুরিপানায় থাকতো ভরে। কচুরিপানার পাতার ঠিক পরের অংশটা ছিল স্পঞ্জের মতো। যে কারণে পানা ভাসতে পারে সহজে। ওই অংশটা ছিঁড়ে তার উপরের আবরণটা খসালেই বেরিয়ে পড়তো সেই স্পঞ্জ। ওটা জলে ভিজিয়ে কিংবা মরা পানার পচা ওই অংশটা দিয়ে তারা শ্লেট মুছতো সুন্দর।

ভিজে ন্যাকড়া হোক বা স্পঞ্জ, কিংবা পানাপচা, যাই দিয়ে মোছা হোক না কেন শ্লেট, শুকাতে একটু সময় নিত। সে সময় দু'হাতে ধরে শ্লেটটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আমরা বলতাম, জলের পোকা জলে যা, আমার শেলেট শুকিয়ে যা। মুখে যতই বলি না কেন, জলের পোকা জলে গিয়ে শ্লেটটাকে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে দিক, এটা আমরা মনে মনে আসলে চাইতাম না। কারণ শ্লেট শুকালে হয়তো শুরু হবে শ্রুতিলিখন, কিংবা অঙ্ক

কষা। সেটাকে যতই বিলম্বিত করে দিয়ে ছুটির ঘন্টাটাকে নিকটবর্তী করা যায়, তারই মহড়া চলতো ছড়ায়।

আর ছুটির কী উল্লাস! এতই তার উচ্চতা, যে এক দৌড়ে তাল গাছের মাথায় উঠতেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ছুটি হলেই, 'ছু—টি, তালগাছের মাথায় উঠি' বলে কী দৌড় সবার! একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট। আর তা যদি বড়ো কোনো ছুটির আগের দিন হতো, তো রবিঠাকুরের 'আজ আমাদের ছুটি ও ভাই'-এর ছেলেটাও হার মেনে যেত।

ছোটো ওয়ান, বড়ো ওয়ানে ছুটির আগের পিরিয়ডে 'ডাক পড়ানো' ছিল বাধ্যতামূলক। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যোগ, যাকে বলে 'ক'-এর বানান, আর তারপর নামতা পড়ানো ছিল 'ডাক পড়ানো'র পাঠ। ভালো পারতো এমন কারুর উপর দায়িত্ব পড়তো। সে আগে যা বলতো, সমবেত ক্লাশ সেটাই উচ্চারণ করতো। উচ্চারণের মাধ্যমে শব্দ বুলালো আর কী। এভাবে পড়িয়ে পড়িয়ে মুখস্ত করিয়ে দেওয়াই ছিল 'ডাক পড়ানো'র উদ্দেশ্য। 'ডাক পড়ানো' হয়ে গেলেই ছুটি,সেই আনন্দে গলা খুলে চলতো উচ্চারণের স্রোত।

উচ্চারণ তো মুখের ক্রিয়া, মনে তখন খেলার জলছবি। ছুটি কেবল কয়েকটা সংখ্যার অপেক্ষা— দশ দশকে একশ বললেই দশের নামতা শেষ—বাড়িতে শালিকছানা পোষা আছে, তারজন্যে ফড়িং মারতে যেতে হবে হোগলডহরীর মাঠে। গরুচরানোর মাঠে বন্ধুরা সব খেলার জন্যে উন্মুখ, কোনো ভাবে কেবল হাজির হওয়ার অপেক্ষা। মাতঙ্গিনীবুড়ির বাগানে বর্ষার মুখে মুখে পেয়ারা পেকে নুয়ে পড়েছে ডাল, আসার পথে দেখে আসা, ছুটি হলেই ভোলাকে নিয়েই ঢুঁ। মণ্ডলদের বটগাছের কোঠরে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে টিয়াপাখির, পাড়ার রতনের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, স্কুল সেরে গেলেই কেবল হয়। গায়েনদের বটগাছের নুয়ে পড়া ডালটাতে আজ দোলনা বাঁধার কথা, যেতে যেতে না ছিঁড়ে ফেলে সব। শরতের মেঘের মতো ইচ্ছাগুলো যত্রতত্র ঘোরে, ডাকপড়ানো শুরু হলে তারা ভীড় করে আসে নানান মনের চারপাশে, তারপর কেবল দশ দশকে একশো হওয়ার বিলম্ব।

আমাদের প্রাইমারি মাঝখানে কোনো রকম পার্টিশান ছাড়া লম্বা একটা হলঘর। প্রথম শ্রেণীর জন্যে সর্বাধিক স্থান। কারণ ভীড়টা সেখানে বেশি। তাই জায়গা যেমন বেশি, ভাগও। প্রথম শ্রেণীর ছিল দু'টো ভাগ। 'ছোটো অন' (ওয়ান) আর 'বড়ো অন' (ওয়ান)। ছোটোতে বর্ণপরিচয় আর আদর্শলিপি, বড়োতে সহজপাঠ আর অঙ্ক। ছোটো-বড়োর গন্ডি পার হলে ক্লাস টু। চট আর চাটাইয়ের মেঝে ছেড়ে বেঞ্চ। তবে ক্লাশ 'টু'তে বসার বেঞ্চগুলো আত্মনির্ভর নয়, সব ক'টার পায়ের জায়গায় ইট দিয়ে সাজানো। সন্ধ্যা দিদিমণির যত্নের সংসার।

ক্লাশ থ্রিতে উঠে আত্মনির্ভরশীল বেঞ্চ। চার পায়ে খাড়া।

তবে বেঞ্চে নয়, ঘনশ্যামবাবুর প্রহারের ধকল সহ্য করার হ্যাপা প্রচুর। হঠাৎ হঠাৎ মেজাজ হারানো ঘনশ্যামবাবুর স্বভাব। তাই প্রহারের বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি বা প্রহর গোনার আগেই অতর্কিতে শুরু হয়ে যেত তান্ডব। হাতের ঘড়ি খুলে যেত, ছড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো, হেড মাস্টার এসে না থামালে হুঁশ ফেরানো দায়! কিন্তু হুঁশ অবস্থায়ও কম যেতেন না। মধুমোড়া, কলমঘাঁটি, পিছমোড়া তো ছিলই, এক পায়ে দাঁড়ানো, রোদ্দুরে নীল ডাউন, কান ধরা, উঠবোস, হাতে ইট নিয়ে উবু হয়ে বসার চর্চা নিয়মিত-ই ছিল। এত মারলে ঘনশ্যাম কি আর ঘনশ্যাম থাকে, ছেলে-মেয়ে সবাই ডাকে ঘুনো মাস্টার।

ঘুনো মাস্টারের প্রহারের এই নিয়মিত রুটিন পার করে তারপর ক্লাশ ফোর।

ক্লাশ নিয়ে আমাদের যে ছড়া, তাতে ফোরে ওঠা মানে গোরু চোরের খাতায় নাম লেখানো। ফোর, গরু চোর। হোক গরু চোর; থ্রি, পায়খানার মিস্ত্রি-র—দুর্নাম থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল। ক্লাশ টু যে বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছিল বিষ্ঠা সেবন করিয়ে, তাও ভালো ক্লাশ ওয়ান, খায় শুধু ফ্যান।

ছোট শিশু মোরা, তোমার করুণা, থাক না থাক তাই বলে কি আত্মসম্মান থাকতে নেই? সব কাটিয়ে ক্লাশ ফোরে উঠে যেন হাঁপ ছাড়া।

এখানে চার পা-ওয়ালা বেঞ্চ তো মিলল, ডাকাবুকো ষণ্ডাগুলোও নেই। ক্লাশফোর যেন পিরামিডের চূড়া।

যে উৎসাহ নিয়ে শুরু হয়, বসার জায়গা দখলের যে লড়াই, অচিরেই তা থেমে যায়। পাশফেলের ছাঁকনি তো কারণ একটা বটেই, জীবন-সংগ্রাম একে একে টেনে নেয় তাদের।

ক্লাস টু-র পেঁচা ওরফে বুদ্ধিশ্বর, ব্যাঙা ওরফে কার্তিকেরা মাথায় যত লম্বা, বুদ্ধিতে ততটা নয়। এদের মতো আরো অনেক পেঁচা, ব্যাঙা, ঘুরঘুরে, ব্যাঙাচি, আরশোলা—প্রফুল্লবাবুর ভ্যাঙানো নামের অনেককে সংসার বড়ো তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে গেল। বাবার সঙ্গে সংসারের চাকায় তেল না দিলে, গাড়ি যে গড়ায় না। তখন চিড়ে-গুড়, ডিম-সয়াবীনের এমন ব্যবস্থা ছিল না। পাশ-ফেলের মাঝখানের দরজাটাও ছিল না এমন হাট করে খোলা। মেয়েদের জ্বালাটা আরো বেশি, তাই সন্ধ্যা, অনিমা, জবা, দীপ্তি-দের কেউ কেউ পাশ নাই করুক, বা বৃত্তি-ই পাক। একে একে ঝরে গেল সব। চার হাত এক করে বাবা-মা দায়মুক্ত হলো। জলের পোকাগুলো তাই জলে গেল চলে। ভীড় কেমন পাতলা হয়ে গেল।

আমরা কেবল পিরামিডের মাথা হয়ে গেলাম। গুটি কয় হাতে গোনা।

ড্রপ আউট চিরন্তন।

ক্রমশ ...

আব্দুল বারী

কৃষিকথা, কৃষক পরিবারের কথা; লুপ্তপ্রায় কৃষিসামগ্রী

শীতের দিনের এক ফোঁটা বেলা। দুপুর গড়াল তো সাঁঝ। মরা মরা আলো কোন তেজ নাই। সূর্যের যেন বড়ো ঘুম পায় এসময়। দুপুরের পর থেকে হাই তুলতে থাকে, একবার চোখ বুজে তো একবার খুলে। তাই জোহরের নামাজ পড়েই বড় চাচা গরু বাছুরের তখিত করতে লেগে যায়। শানি পানি খাওয়ানো থেকে শুরু করে বেলা পড়লেই গরুর গায়ে ঝুল চাপিয়ে দেয়। একখানা আস্ত চটের বস্তা কেটে গরুর পিঠের উপর দু দিকে ঝুলিয়ে দেয়। কুঁজের কাছে একটু ফাঁক থাকে। বস্তার লম্বা পাশের সেলাইয়ের একদিক পুরো কাটা হয় আর আড়াআড়ি দিকের সেলাই কেটে গরুর পিঠ বরাবর চাপিয়ে দেওয়া হয়। শীতের দিনে বেশ একটু গরম ধরে। হিম আটকায়। ঝুল চাপানোর আগে বড় চাচা গরুর পিঠ, পা, গলা মাঝেমাঝে বেশ করে ডলে দেয়। মানুষের সাথে কথা বলার মতো করে গরু বাছুরের সাথে কথা বলে। অবলা জীব কখনো খেতে থাকে, কখনও পাতনা বা ডাবান থেকে মুখ তুলে চোখ বুজে আয়েশ করে আদর খায়। মনিবের কথা শোনে। মাঝে মাঝে ফোঁস করে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে। গলাটান করে মেলে দেয়। কখনও মাথা দোলায়, কান ঝাড়ে। এক অদ্ভুত দৃশ্য রচিত হয় গোয়াল বাড়িতে। আলাদা করে দেখন সই পশু প্রেম নয়, অন্তর থেকে উদ্গত মমত্ববোধ। যেখানে কোনো মেকি নেই , ফাঁকি নেই। এখন টিভিতে, খবরের কাগজে, সোশ্যাল মিডিয়ায় পশুপ্রেম, প্রকৃতি প্রেম নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। তার কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু মেকি বোঝা যায় না। তবে একটা দেখন সই বা নিজেকে জাহির করার ভাব যে থাকে তা বলাই যায়। এখনতো বিজ্ঞাপনের যুগ, প্রচারের যুগ। নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা, প্রচারের আলোয় আনার এক মরিয়া প্রচেষ্টা থাকে। প্রচার পাওয়ার এতটুকু সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে না। এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে তো আরো বেশি আত্মপ্রচার দেখা যায়। পশু পাখির সঙ্গে ছবি তুলে সুন্দর করে ক্যাপশন

লিখে ফেসবুকে ছাড়া হয়। লাইক কমেন্টের বন্যা বয়ে যায়। একটু সেলিব্রিটি বা রাজনীতির লোক হলেতো কথাই নাই। চাটুকারিতা সীমা ছাড়ায়। তবে সবক্ষেত্রে সবাই যে আত্মপ্রচারের জন্য করে এমন নয়। অনেকেই মন থেকে ভালোবেসে এ কাজ করে। অন্য মানুষদের ভালো কাজে উৎসাহিত করে।

বড় চাচা বেশ করে গরুগুলোকে আদর করে, গল্প শোনায় আর সময় সময় শানি খৈল পাতনায় মেখে দিতে থাকে। খাবারের সাথে মনিবের আদর স্নেহ মাখা থাকায় তৃপ্তি করে খায় গরুগুলো। ছন্দে ছন্দে মাথা নাড়ে। একমুখ শানি পাতনা থেকে তুলে মুখ উঁচু করে চিবাতে থাকে। এই খাওয়া দেখে বড় চাচার চোখে মুখেও এক তৃপ্তি ফুটে ওঠে।

ছোটচাচা বিয়ের কয়দিন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় গরুগুলোর একটু অযত্ন হয়েছিল। তা নিয়ে বড় মা আফসোসের সাথে অনুযোগ করে কেঁদেছিল। সেদিন বড় চাচা বলেছিল হবে গো হবে এদেরও যত্ন হবে। এরা আমাদের অন্নদাতা, এদের অবহেলা করতে পারি। তুমি বাপু একটু শান্ত হও। বারোমাসই যত্ন হয়, এখন যেন একটু বেশিই হচ্ছে। ওই কদিনের অযত্ন এখন যেন পুশিয়ে দিচ্ছে।

তখনকার দিনে গরু ছিল গৃহস্থের কাছে সন্তানের বাড়া। জমি জায়গার সাথে কৃষকের সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া, জমিতে কৃষকের মন প্রোথিত করা, শেকড় গাড়ার কাজ করত এই গরু বাছুর। লাঙল জুড়ে লাঙলের ফলায় মাটি ফালাফালা করে তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে হয়। ঘুমন্ত মাটিকে জাগিয়ে ফসলের আবদার করার প্রাথমিক কাজ তো গরুর লাঙল দিয়েই শুরু। লাঙল এর ফলায় ফলায় ফসলের স্বপ্ন রোপিত হয়। গরু ছাড়া এ কাজ চলে? তাই গরু ছিল কৃষকের বন্ধু, সন্তান। তাদের অবহেলা করা যায়?

তখনকার দিনে গরু ছিল গৃহস্থের কাছে সন্তানের বাড়া। জমি জায়গার সাথে কৃষকের সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া, জমিতে কৃষকের মন প্রোথিত করা, শেকড় গাড়ার কাজ করত এই গরু বাছুর। লাঙল জুড়ে লাঙলের ফলায় মাটি ফালাফালা করে তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে হয়। ঘুমন্ত মাটিকে জাগিয়ে ফসলের আবদার করার প্রাথমিক কাজ তো গরুর লাঙল দিয়েই শুরু। লাঙল এর ফলায় ফলায় ফসলের স্বপ্ন রোপিত হয়। গরু ছাড়া এ কাজ চলে? তাই গরু ছিল কৃষকের বন্ধু, সন্তান। তাদের অবহেলা করা যায়?

ফলায় ফলায় ফসলের স্বপ্ন রোপিত হয়। গরু ছাড়া এ কাজ চলে? তাই গরু ছিল কৃষকের বন্ধু, সন্তান। তাদের অবহেলা করা যায়?

গরু বাছুরের অসুখ হলে মানুষ বড় আতান্তরে পড়ত। পরিবারের কোন মানুষের অসুখের চেয়ে বেশি ব্যস্ত হতো। সারারাত ঘুম থাকত না। গরুর হয়তো পেট চড়েছে বা ধেড়াচ্ছে কিংবা খুরুই হয়েছে, কষ্ট পাচ্ছে খুব। পরিবারের অনেকেরই সেদিন ঘুমাত না। পেট চড়া গরু কষ্টে গোঙায়। পেট ফুলে ঢোল। নাক মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। বড় চাচা, বড়মা হ্যারিকেন জেলে বসে থাকে গোয়ালে। গরুর চারপাশ ঘুরে গায়ে হাত বুলায়। অবলা জীবের কালো দুচোখ বেয়ে পানির ধারা নামে। বড়মার দু-গালও ভিজে যায়। গরুর সঙ্গে বড়মারও দীর্ঘশ্বাস পড়ে। পারলে যেন এখনই সবটুকু ব্যথা মুছে নেয়। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গরু বাছুরের অসুখ হলে এমন দৃশ্য দেখা যেত। তখন এখনকার মতো এমন উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। গরু বাছুরের অসুখ হলে গাছ-গাছড়া খাওয়ানো হতো। গ্রামের কোন মানুষ বা পাশের গ্রামের কেউ এমন ওষুধ-পথ্য দিত। তা খাইয়ে কখনো গরু-বাছুর বাঁচত , কখনো মারা যেত। মারাই যেত বেশি।

গরু বাছুরের ডাক্তারি চিকিৎসা যে ছিল না তা নয়। ডাক্তার ছিলেন ,তবে তারা থাকতেন অনেক দূরে। দশটা গ্রাম ঠেঙিয়ে একটা ডাক্তার বের হতো না। আমাদের গ্রাম থেকে সাত কিলোমিটার দূরে বেলডাঙায় একটা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল। এখনো আছে। তবে তখন অসুস্থ পশুকে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বলদের অসুখ হলে অন্য জনের বলদ ধার করে গাড়ি জুড়ে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হতো। অনেকেই অসুস্থ গরুর ছোঁয়া বাঁচাতে বলদ ধার দিত না। আবার অনেকের চাষের কাজ থাকায় বলদ দিত না। একদিন চাষ না করতে পারলে জমির জো হারাবার ভয় থাকে। ফসল তোলার সময় হলে তো কথাই নাই। এক বেলাও কামাই করা যায় না। আবার ডাক্তারকে মুখে বলে ওষুধ এনে খাইয়ে তেমন সুফল পেত না। ডাক্তার কে বাড়িতে নিয়ে এসে গরু দেখিয়ে চিকিৎসা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ফলে হাতের মাথায় যা পাওয়া যায় পানিপড়া,গাছ-গাছড়া, ঝাড়ফুঁক, মাদুলি এসব করে প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টা চলত। আর সেইসাথে খোদার কাছে প্রার্থনা।

এখন কিছু কিছু পঞ্চায়েতে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কত রকম ওষুধ পথ্য দেওয়া হয় সেখান থেকে। পঞ্চায়েতের ডাক্তার ছাড়াও গ্রামে গ্রামে প্রাণী চিকিৎসক দেখা যায়। এরা সরকারি বা বেসরকারি নানা জায়গা থেকে চিকিৎসা বিষয়ে ট্রেনিং নিয়ে গ্রামে গ্রামে পশু চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছেন। মোবাইলের যুগ। ফোন নম্বর দেওয়া আছে। ফোন করলেই ডাক্তার হাজির বাড়িতে। মোটর সাইকেলের পিছনে ঔষধপত্র, নানা চিকিৎসা সরঞ্জাম বাঁধা থাকে। অসুস্থ গরু নিয়ে আর টানাটানি করতে হয় না। কোথাও নিয়ে যেতে হয় না। ফোন করলেই এই সব চিকিৎসক বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা করেন। এখন গরু গরম

হলে আর ষাঁড়ের কাছে নিয়ে ছুটতে হয় না। প্রাণী বন্ধুদের কাছে তরল নাইট্রোজেনে হিমায়িত থাকে বীজ। বাড়িতে গিয়ে সেই বীজ কৃত্রিমভাবে প্রোথিত করে গাভীর গর্ভে। কৃত্রিম প্রজনন।

প্রচন্ড অসুস্থ গরু চার হাত পা এড়া দিয়ে পড়ে আছে, বাঁচার আশা কম। তবুও বলে ডাকতো একবার ওয়াজেদ ডাক্তারকে। দেখে যাক একবার। ফোন পেয়ে প্যাশন প্রো মোটরবাইক নিয়ে ছুটে আসেন ওয়াজেদ ডাক্তার। বাইক থেকে নামায় চিকিৎসার ব্যাগ। শুরু করে চিকিৎসা। পটাপট ইনজেকশন দেয়, প্রয়োজনে স্যালাইন টানায়। কয়েক ঘন্টা পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে গরু। দু-এক দিনের মধ্যে উঠে দাঁড়ায়, খাবার খায়। এদিকে একটা গরুর চিকিৎসা শেষ হতে না হতেই ফোন বেজে ওঠে। আবার ছোটে। সারাদিন শুধু ছুটছে আর অবলা জীব এর প্রাণ রক্ষা করে চলছে। নিজের ঠিকমতো নাওয়া খাওয়ার সময় নাই। সময় পাবে কি করে, মানুষ এমনভাবে ফোন করে তৎক্ষণাৎ না গিয়ে উপায় থাকে না। কেউ কেউ কান্নার সুরে অনুনয় করে। বড় বে-রায় গো ডাক্তারবাবু, বড় বে-রায়। গরিবের সম্বল,একটু তাড়া করে এসো গো। আমার গরুটা বাঁচিয়ে দাও। হয়তো এই গরুটা বেচে গতবছর বিয়ে দেওয়া মেয়ের পনের গলার হার কিংবা কানের দুলের দেনা শোধ করবে। গরুটা মারা গেলে মেয়ের উপর নির্যাতন নেমে আসবে। তাই গরুর অসুখ হলে কান্না থামে না। কেঁদে ফেলে আর অনুনয়ের সুরে ফোন করে। হাতের ভাত ঝেড়ে ফেলে খাওয়া থেকে উঠে ছুটতে থাকে ওয়াজেদ ডাক্তার।

প্রচন্ড অসুস্থ গরু চার হাত পা এড়া দিয়ে পড়ে আছে, বাঁচার আশা কম। তবুও বলে ডাকতো একবার ওয়াজেদ ডাক্তারকে। দেখে যাক একবার। ফোন পেয়ে প্যাশন প্রো মোটরবাইক নিয়ে ছুটে আসেন ওয়াজেদ ডাক্তার। বাইক থেকে নামায় চিকিৎসার ব্যাগ। শুরু করে চিকিৎসা। পটাপট ইনজেকশন দেয়, প্রয়োজনে স্যালাইন টানায়। কয়েক ঘন্টা পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে গরু। দু-এক দিনের মধ্যে উঠে দাঁড়ায়, খাবার খায়। এদিকে একটা গরুর চিকিৎসা শেষ হতে না হতেই ফোন বেজে ওঠে। আবার ছোটে। সারাদিন শুধু ছুটছে আর অবলা জীব এর প্রাণ রক্ষা করে চলছে।

ওয়াজেদ ডাক্তার হরিণ ঘাটায় দুই বছর ও অন্যত্র ছয় মাস ট্রেনিংপ্রাপ্ত পশুচিকিৎসক। সরকারিভাবে কোনো নিয়োগপত্র নাই তবে এলাকায় খুব হাতযশ। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। ভোর থেকে শুরু করে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত ছুটে বেড়াতে হয় দশ গ্রামে। কাজিসাহা, কাপাসডাঙ্গা, বেগুনবাড়ি, হিজুলি, আন্ডিরন, নবাব বাড়ি, মির্জাপুর। এসব গ্রামে তার খুব খ্যাতি। পঞ্চায়েতের ডাক্তার বাবুরা আছেন, মানুষ সেখানেও যায়। চিকিৎসা নেয়। তবে সেখানকার থেকে বেশি ভরসা করে আমার বড়দা এই ওয়াজেদ ডাক্তারকে।

বিকেল ঢলার মুখে চাচা পাটকাঠি, শুকনো খড় দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তার উপর ভিজা খড়, পাতনার পাশে গরুর না-খাওয়া পড়ে থাকা ভেজা শানি চাপিয়ে দেয়। বেশ ধোঁয়া উঠতে থাকলে তার উপর চাপিয়ে দেয় ঘসি (ঘুঁটে)। শুকনো ও ভেজা ঘসি চাপানো হয়। ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া উঠতে থাকে। সারা পাড়া জুড়ে উঠছে ধোঁয়া। ধোঁয়া ধূসরিত পাড়া আসন্ন সন্ধ্যাকে আমন্ত্রণ জানায়। সন্ধ্যায় এখন আর সাঁজালের ধোঁয়ায় পাড়া ঢাকে না। পেট্রোল ডিজেলের কটু গন্ধ ওড়ে বাতাসে।

সাঁজাল জ্বালানোর পর বড় চাচা গরুর তলপেটের কাছে বসে ডাঁস মারতে থাকে। বড় বড় একপ্রকার মাছি। গরুর পায়ে, তলপেটে বসে রক্ত চুষতে থাকে। লেজ নেড়েও গরু তাদের তাড়াতে পারে না। বেঁচে থাকার কৌশল সব প্রাণীই জন্মগতভাবে রপ্ত করে। তাই লেজের বাড়ি খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে লেজের নাগালের বাইরে তলপেটে, সামনের পায়ে কিংবা পিছনে পায়ের ভেতরের দিকে বসে রক্ত খায়। চাচা গোয়াল ঘরের ভেতরেও সাঁজাল দেয়। দিনে বসে থাকা মশা, মাছি গোয়াল থেকে বেরিয়ে আসে। বেশ করে গোয়ালের চারপাশে একটা তালপাতার ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়তে থাকে। তালপাতার যে পাতাগুলিতে হাত পাখা তৈরি হয় সেরকম একটা পাতার সামনের দিকটায় একটু চিরে এই ঝাড়ন তৈরি করা হত। ঘরের সব কোন, দেওয়াল এই তাল পাতার ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে মশা মাছি সব বের করে দিত। ধোঁয়া আর ঝাড়নের বাড়িতে মশা মাছি ঘরে থাকতে পারত না।

সন্ধ্যায় গোয়ালে গরু-বাছুর ঢুকানোর আগে এই ঝাড়ন দিয়ে গরু বাছুরের গা পা গুলোকেও ছেড়ে দিত। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সবসময়ই এভাবে সাঁজলের ধোঁয়া দেওয়া, ঝাড়ন দিয়ে গোয়াল ঝাড়া হত।

গরু-বাছুর গোয়ালে তুলিয়ে দিয়ে গোয়ালঘরের মুখে সড়কি নামিয়ে দেয় চাচা।। ঘরের দরজার প্রস্থ সমান বা দু আড়াই হাত লম্বা করে বাঁশের চটা ও খিল তুলে সরু পাটের দড়ি বা ঘাসের দড়ি দিয়ে সপ বা মাছ ধরা বিত্তির মতো বুনিয়ে তোলা হয় সড়কি। শুধু গোয়ালঘরে নয় গৃহস্থ বাড়ির অনেক ঘরের জানালা, দরজায় টাঙ্গানো থাকতো এই সড়কি। মশা মাছি যেমন আটকায় তেমনি ঘরের ভেতরের জিনিসপত্রও দেখা যায় না। আমাদের এলাকায় এই সড়কির খুব প্রচলন ছিল। এমনকি সদ্য বিয়ে হয়ে আসা মেয়ে

জামাই দিনের বেলায় সড়কি ফেলে ঘরের মধ্যে বসে থাকত। অনেকে বাড়িতে দরজায় কাঠের কপাট এর পরিবর্তে এই সড়কি ব্যবহার করত। সাধারণ মানুষদের কাছে এ ছিল দারুণ এক কাজের জিনিস। অবশ্য অনেক গৃহস্থ বাড়িতে কাঠের দরজা থাকলেও একটা সড়কি বাইরের দিকে টাঙিয়ে রাখত। গরমের দিনে ঘরের দরজা খুলে শুয়ে থাকে মানুষ, দরজার কপাট না দিয়ে সড়কি ফেলে দেয়।। দিনের বেলা বা অপ্রয়োজনে বিছানোর মত গোল করে গুটিয়ে দরজার উপর বেঁধে রাখ, সন্ধ্যায় বাঁধন খুলে দাও, সরসর করে নেমে যাবে মেঝে পর্যন্ত। এখন গ্রামগঞ্জে এই সড়কির একদমই ব্যবহার নেই। নেই গরু বাছুরের গা ঝাড়া তালপাতার ঝাড়নও।

চাচা গোয়াল ঘরের সামনে ও পাশে কতগুলো জিনিস দেখে নেয়। লাঙল, লাঙল জোড়া জোয়াল, মই, মই বাঁধা মোটা দড়ি, আর গরুর গাড়ি জোড়া সিমলি। গোয়ালের এক পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে লাগানো থাকে লাঙল। তার পাশে খাড়া করে রাখা জোয়াল, দেওয়ালের গায়ে লম্বাকরে টাঙানো মই। আর তার পাশে দেওয়ালের গায়ে মোটাকঞ্চির গুঁজি পুঁতে তাতে ঝোলানো সিমলি। সব দেখে নেয়। সকাল সকাল মাঠে যাওয়ার সময় যাতে কোন কিছু খুঁজে বেড়াতে না হয়। গোয়াল ঘরের বারান্দায় আরো কতগুলো জিনিস বারো মাস থাকে। যেমন হেঁসু ঘসা কাঠের পাটা। যাকে আমরা বলি বেলিট। দুই তিন ইঞ্চি চওড়া, আড়াই তিন ফুট লম্বা, দুই ইঞ্চি পুরু কাঠের পাটা। এতে চিকন বালি দিয়ে ঘষে ঘষে হেঁসুতে ধার তোলা হয়। ঘষে ঘষে হেঁসু ধারালো করাকে ধার দেওয়া বলে। আগে মাঠে শস্য কাটতে যাওয়ার আগে, গরুর জন্য খড় কাটতে বসার আগে বেশ করে হেঁসুতে ধার দেওয়া হত।

বালি রাখা থাকত বাঁশের চোঙে। তলতা বাঁশের একদিকে পাব রেখে আর এক দিকে পাব এর নিচ থেকে কেটে নেওয়া হত। এক পাব বাঁশের মাঝের ফাঁকা অংশে বালি রাখত। সামনের দিকটা ঝর্ণা কলমের নিবের মতো সূচালো করা, সেখানে একটি ফুটো করে দড়ি বেঁধে দেওয়ালে ঝুলিয়ে বা দেয়ালের গায়ে খাড়া করে লাগিয়ে রাখা হতো।

এই হেঁসু ঘসা বেলিট মাঝে মাঝে অস্ত্র হয়ে উঠত। কতদিন দেখেছি পাড়াপড়শি কিংবা ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হতে হতে বেলিট নিয়ে ছুটছে একে অপরের দিকে।। আবার কখনো কখনো কুকুর তাড়ানোর কাজেও লাগতো। শক্ত কাঠের এই বেলিটের বাড়ি দিলে মারাত্মক জখম হয় মানুষ। অনেক সময় বৌ ঠ্যাঙাতেও বেলিটের ব্যবহার দেখেছি। একবারের একটা ঘটনা বলি । আমাদের পাড়ায় এক মাতব্বর টাইপের মানুষ ছিল, গরুর ব্যাপারী। মাঝেমাঝেই বৌ ঠ্যাঙায়। সেদিন কি নিয়ে সামান্য ঝগড়া। ঝগড়া হতে হতে মাতব্বর হঠাৎ বেলিট তুলে বউকে ঠ্যাঙাতে থাকে। মানুষজনের আটকানোর আগে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়। গায় পায়ে তো যা লাগার লাগে ,একটা আঘাত লাগে মাথায়। হাত দিয়ে বউটা খানিকটা আটকায়, না হলে মাথা ফেটে দু-ফাঁক হয়ে যেত। গলগল করে

মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। যতটা না ব্যথায় তার চেয়ে বেশি মনোকষ্টে। কারণ এর আগে মার খেয়ে ও একবার ডাক্তারখানা গিয়েছিলো। কিছু ওষুধ এনে খেয়ে ছিল। তার জন্য আবার মেরেছিল মাতব্বর। বলেছিল তু কার হুকুমে ডাক্তারখানায় গেলি? কার সাথে গেলি? কে তুকে ওষুধ খেতে বলল? এমন নানান তর কথা বলে আবার পিটিয়ে ছিল।

রক্ত ঝরছে। দুজন মেয়ে বৌটাকে ধরে নিয়ে আসে আমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়িতে ফাস্ট এইড বক্স থাকে। এতে থাকত তুলো, ব্যান্ডেজ, ডেটল, সেলাই এর সরঞ্জাম ও কিছু ব্যথার ঔষধ। বড়দা মাধ্যমিক পাশ করার পর কিছুদিন আব্দুল হালিম মামার ডাক্তারখানায় বসে সেলাই করা, ইনজেকশন দেওয়ার কাজ শিখে ছিল।

মেয়ে দুটো ধরাধরি করে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসে বউটাকে। মাথা অনেকটা কেটে গেছে। হাতে পায়ে আঘাতও বেশ। বড়দা বলল হাসপাতাল নিয়ে যাও কিংবা ডাক্তারখানা। বউটা কোন মতেই যাবে না। এক পাও নড়তে রাজি নয়। সে কিছুতেই বুঝতে চাইছে না যে এখানে তার চিকিৎসা সম্ভব নয়। কিন্তু সে কোথাও যাবে না। কি করা যায়। অন্য কয়েকজন মেয়ের অনুরোধে অগত্যা সেলাই করে, ভালো করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল বড়দা। আর কয়েকটা ব্যথার ওষুধ দিয়ে দিলো। মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। যতটা না ব্যথায় তার চেয়ে বেশি মনোকষ্টে। কারণ এর আগে মার খেয়ে ও একবার ডাক্তারখানা গিয়েছিলো। কিছু ওষুধ এনে খেয়ে ছিল। তার জন্য আবার মেরেছিল মাতব্বর। বলেছিল তু কার হুকুমে ডাক্তারখানায় গেলি? কার সাথে গেলি? কে তুকে ওষুধ খেতে বলল? এমন নানান তর কথা বলে আবার পিটিয়ে ছিল।

সত্যি তখনকার দিনে মেয়েদের খুব দুরবস্থা ছিল। স্বামীর হাতে মার খেয়েও লুকিয়ে বেড়াতে হতো। সাহস করে সবার সামনে মারের আঘাতের জায়গা দেখাতে পারতো না। আবার অনেকক্ষণ বাড়িতেও ঢুকতে পারত না। কারো বাড়িতে বসে থাকত। বাড়ির মরদরা কাজে কামে বেরিয়ে গেলে তখন বাড়ি ঢুকে কাজ করত। কিংবা পাড়ার বা আত্মীয় কোন মহিলা ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে বাড়িতে দিয়ে আসত। একা ঢুকতে সাহস পেত না। অধিকাংশ মেয়েই এই অত্যাচার সহ্য করে স্বামীর ঘর করত। কিছু মেয়ে বাপের বাড়ি খবর দিয়ে লোক এনে

সালিশ বসাতো। তবে তা খুব কম জনই করত। আর তার থেকেও কম জন থানা পুলিশে যেত। নারীর অধিকার, নারী স্বাধীনতার হাওয়া দেশে-বিদেশে বইতে শুরু করলেও তখনও গ্রাম গঞ্জের গলিঘুঁজিতে সে হাওয়া ঢোকেনি। বয়স্ক মহিলারা অল্প বয়স্ক বউদের বোঝাত স্বামী-সন্তান-সংসার মেয়েদের আসল আশ্রয়। সংসার ফেলে পা তুলে বাপ মায়ের বাড়ি যেতে নাই। বাপ মা চোখ বুজলে ভাই ভাজের সংসারে পরগাছা হয়ে থাকা আরও কষ্টের। এসব কথার সাথে কোন মেয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতে এসে থেকে ছিল, পরে তার কি দুর্গতি হয়েছিল তার উদাহরণ টেনে বোঝাত। আরো বলতো মরদ মানুষ এমন একটু বদরাগী না হলে মানায়। মরদ মানুষের দাপটই হবে আলাদা। আবারও উদাহরণ টানত অমুকের স্বামী ছিল বদরাগী । মেয়েটা মুখ বুঝে সব সহ্য করে আজ কেমন সোনার সংসার পেয়েছে। সোনার সংসারই তো। ছেলেপুলে নাতি-নাতনি নিয়ে এক বড় সংসারের গিন্নি আজ। একবারে রাজপাটের রাণী। তাছাড়া কত জনকে দেখলাম প্রথম প্রথম বউকে পিটাতো। পরে তারাই বউকে খুব ভালবেসেছে। তাদের ভালোবাসা লায়লা মজনু কেও হার মানায়। বউকে তখন আর চোখে হারায় না। মেয়ের কূলে জন্ম হলে এমন অত্যাচার একটু সহ্য করতেই হবে। তবে তো সোনার সংসার পাওয়া যাবে। মুসলিম পরিবারে নিরক্ষর মহিলারা এমন নানা কথা বলে মেয়েদের বুঝিয়ে সংসার মন বসাত। পাড়াপড়শি গ্রামের নানা মেয়েদের উদাহরণের সাথে ধর্মকথা শোনাত। সে হাদিস কবে কার বানানো তা বলা কঠিন। অধিকাংশ কিসসা-কাহিনি। হাদিস-কোরআনের কথার সাথে এমন কিসসা কাহিনী বলে মেয়েদের মনে ভয় ঢোকাত। সীমিত গন্ডির জীবনে আবদ্ধ নারীমন সহজ বিশ্বাসে সবকিছু মেনে নিত। স্বামীর সংসার তাঁর সবচেয়ে নিরাপদ এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয় এ বোধ জেগে উঠত। তাই বদরাগী স্বামীকে অবলম্বন করে শত অত্যাচার মাথা পেতে নিয়ে সংসার করে যেত।

এবার গৃহস্থ বাড়িতে বর্তমানে লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় কতগুলি কৃষি যন্ত্রপাতির কথা বলে নিই। আগের দিনে এসবের বহুল ব্যবহার থাকলেও এখন আর নাই বললেই চলে। নতুন যুগের নতুন নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি আসায় পুরোনো জিনিস গুলো হারিয়ে গেছে। এমন কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করছি এখানে।

কাঁদাল: তিন - সাড়ে তিন হাত লম্বা বাঁশের আগালচি বা লাঠির ডগাই আধখানা চাঁদের মতো লোহার গোল ফলা দিয়ে বানানো হতো কাঁদাল। পৌষ-মাঘ মাসে বিল মাঠের জলাজমির ধানের শীষ কেটে এনে গরুর মলন দিয়ে ঝরানো হত। ঘানি গাছে গরু ঘোরানোর মত গরু ঘুরত মলনের উপর। তার আগে বেশ পুরু করে শীষ কাটা ধানের গাছ বিছিয়ে দেয়া হতো। তিন চারটে গরু ঘোরার সময় মাঝে মাঝে একজন এই কাঁদালের ফলা দিয়ে পোয়াল (ধানঝরে যাওয় গাছ) নেড়েচেড়ে আলগা করে দিত। ছোটবেলায় কতদিন এই কাঁদালের গুঁতো খেয়েছি তার ইয়াত্তা নেই। পুরু করে চাপানো পোয়াল বেশ

নরম নরম। হাঁটতে, দৌড়াতে, গড়াগড়ি খেতে বেশ লাগে। আমরা ছোটরা মলন জুড়লে গরুর পেছন পেছন ছুটতাম। কখনো গড়াগড়ি করতাম, কখনো ডিগবাজি খেতাম। কাঁদাল দিয়ে পোয়াল আলগা করার সময় কাঁদালে পোয়াল বাঁধিয়ে একটু উঁচু করে ফেলে দেওয়া হত। পোয়াল নাড়ার সময় আমাদের গায়ে মাথায় ধান, ধানের কুটি পড়ত। তাতে কী ! কী আনন্দ, কী আনন্দ। গা কুটকুট করত। তাতেও মজা। আমাদের এই ছোটাছুটি করাতে বড়রা বিরক্ত হতো। মাঝে মাঝে কাঁদালের আলতো গুঁতো দিয়ে আমাদের তাড়াত। তাড়ালে কি হবে আমার গেলে তো। একটু সরে গিয়ে আবার মলনে উঠে ঘুরতাম। শৈশবের সেই দিনগুলির কথা মনে পড়লে মন বড় উদাস হয়। বুকের ভেতর কেমন এক অজানা অচেনা যন্ত্রণা ধীর গতিতে বয়ে যায়। ভোররাতের মরা চাঁদের মত বিষণ্ণতায় ছেয়ে যায় বুকের ভেতর। শীতের ভোরে পোয়াল গাদায় আর একবার গড়াগড়ি করতে বড় ইচ্ছে করে। কিন্তু উপায় কি। এখন মাঠে সেই কাজলগরি, হলদিগরি, হুমকেলি ধান নাই। পোয়াল নাই ,কাঁদাল নাই, মলন নাই। আর নাই সেই দুরন্ত শৈশব। মন খারাপের বিষণ্ণতায় ডুবতে ডুবতে শৈশব স্মৃতিতেই সাঁতার কাটি।

নাঙাল বা বিঁদে: এক বিশেষ ধরনের কৃষি যন্ত্র। তিন চার ফুট লম্বা আর দুই ইঞ্চি পুরু কাঠের পাটা নিয়ে দশ-বারোটি ফুটো করে লোহার লম্বা লম্বা ফলা গুঁজে তৈরি করা হত নাঙাল। এখনকার ট্রাক্টরের লাঙলের ফলার মতো একটু বাঁকানো। সমান দূরত্বে এই ফলা গুলি রাখা থাকত। আর কাঠের পাটার ঠিক মাঝখানে গোল করে বিঁদ করে একটা কাঠের দন্ড লাগাত। একে বলা হয় ইশ। এই ইশে জোয়াল জুড়ে গরুর সাহায্যে বা হাতে করে টেনে টেনে জমির মাটি আলগা করা হতো। বিশেষ করে বোনা ধানের জমিতে ধান খুব ঘন বা পাতলা হলে নাঙাল টেনে কিছু ধান উপড়ে দিত। এতে মাটি যেমন আলগা হত তেমনি কিছু ধানের চারা উঠে গিয়ে ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যেত। নির্দিষ্ট দূরত্বে লোহার ফলা থাকায় খুব সুন্দর সারিবদ্ধভাবে ধান গাছ থেকে যেত। এই কাজকে আমরা কাড়ান দেওয়া বলতাম। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে 'নাই ধান তো কাড়ান দিয়ে আন'। অঞ্চলভেদে কাড়ানের জায়গায় নাঙাল বা বিঁদে শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যে জমিতে ধান গাছ খুব ফাঁকা ফাঁকা হয়ে থাকত সে জমিতেও কাড়ান দিয়ে মাটি আলগা করে দিত। মাটি আলগা হলে আলো বাতাস পেয়ে খুব দ্রুত ধান গাছে জোর ধরে যেত। পাতলা গাছগুলি দ্রুত ঝাড় করে জমি ভরিয়ে দিত। কিছুদিনের মধ্যে ধানের চারায় জমি ভরে যেত। পাতলা ধানের জমিতে দুবার কাড়ান দিলে আর মাটি দেখা যেত না। এজন্যই বুঝি ঐ প্রবাদের উদ্ভব। এখন বিঁদেও নাই, কড়ানও নাই।

দুনি বা ডোঙা: ক্ষেতে জল সেচনের পাত্র বিশেষ। নদী নালা থেকে জল তুলে জমিতে দেওয়ার পাত্র। বহু প্রাচীন এক জলসেচন পদ্ধতি। দশ বারো ফুট লম্বা, এক দেড় ফুট চওড়া, এক ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শক্ত করগেটের তৈরি যন্ত্র হলো দুনি। তৎসম বা সংস্কৃত

মেয়ের কূলে জন্ম হলে এমন অত্যাচার একটু সহ্য করতেই হবে। তবে তো সোনার সংসার পাওয়া যাবে। মুসলিম পরিবারে নিরক্ষর মহিলারা এমন নানা কথা বলে মেয়েদের বুঝিয়ে সংসার মন বসাত। পাড়াপড়শি গ্রামের নানা মেয়েদের উদাহরণের সাথে ধর্মকথা শোনাত। সে হাদিস কবে কার বানানো তা বলা কঠিন। অধিকাংশ কিসসা-কাহিনি। হাদিস-কোরআনের কথার সাথে এমন কিসসা কাহিনী বলে মেয়েদের মনে ভয় ঢোকাত। সীমিত গন্ডির জীবনে আবদ্ধ নারীমন সহজ বিশ্বাসে সবকিছু মেনে নিত। স্বামীর সংসার তাঁর সবচেয়ে নিরাপদ এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয় এ বোধ জেগে উঠত। তাই বদরাগী স্বামীকে অবলম্বন করে শত অত্যাচার মাথা পেতে নিয়ে সংসার করে যেত।

শব্দ দ্রোণী থেকে দুনি শব্দটি এসেছে। এতে করে জলসেচ করতে গেলে বেশ কিছু বাঁশ প্রয়োজন হতো। ডোবা-নালা বা নদী পুকুর থেকে জল তোলার জন্য জলের উপর অর্থাৎ পাড়ের কাছে দুটি বাঁশ পুঁতে আরেকটি বাস জলের সমান্তরালে রেখে একটি মঞ্চ তৈরি করা হতো। ডাঙ্গায় দুনির মাঝ বরাবর দুটি বাঁশপুঁতত। আর উপর দিয়ে একটি বাঁশ বাঁধা হত। উপরের বাঁশে সামনের দিকে বেশ কিছু ভার ঝুলানো থাকত। আর পিছন দিকে অর্থাৎ জলের কাছে একটা বাঁশের আগাচি বা মোটা দড়ি উপরের বাঁশের সঙ্গে ঝোলানো থাকত। সেই দড়ি বা আগালচি হাত দিয়ে টেনে নামিয়ে দুনিকে জলের সমান্তরালে আনা হতো। তারপর ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার মতো পা দিয়ে চাপ দিয়ে জলে ডুবিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো। খোলে অনেক জল ভরে যেত আর সামনে ভার থাকায় আপনা আপনি নেমে যেত দুনি। পিছনে দিক একটু উঁচু আর সামনের দিক একটু নিচু হওয়ায় আপনা আপনি জল নেমে যেত। আগের দিনে মাঠে এই পদ্ধতিতে জলসেচ দেখেছি। এখন আর দেখা যায় না। এখন বিভিন্ন পাম্পের সাহায্যে জল তুলে জমিতে দেওয়া হয়। ইলেকট্রিক

মোটর দিয়ে মাটির নিচ থেকে পাইপের সাহায্যে জল তোলা হয়। যাকে আমরা বলি শ্যালো মেশিন। জল তোলা কিলস্কার মেশিনও ছিল, যা দিয়ে পুকুর নদী থেকে জল তোলা হতো। এখন হালকা হোন্ডা চায়না মেশিন বাজারে চলে এসেছে। ফলে মানুষ আর জলসেচের ওই প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করে না।

ছেনি: তলতা বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি ত্রিভুজ আকৃতির জল সেচনের পাত্র বিশেষ। কেবল বাঁশের চটা দিয়েই নয় গুড় বা তেলের টিন কেটেও তৈরি করা হত ছেনি। সামনের দিকে দেড় ফুট লম্বা আর পেছনে দিকে ক্রমশ একজায়গায় মিলিয়ে দেওয়া। সামনের দিক কুলোর মত আর পিছনের দিক ক্রমশ উঁচু।। সামনে পিছনে লম্বা দড়ি বেঁধে দুজন দুদিকে জলের কিনারে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে দড়ি ধরে টেনে টেনে জল তোলা হতো। ছেনি ওজনে হালকা হওয়ায় সহজেই বহন করা যেত। দূর বা কাছের মাঠে জল সেচের কাজে লাগাত। বিশেষ করে উঁচু জমিতে যেখানে দুনি ব্যাবহার করা যেত না সেখানে এই ছেনির বহুল ব্যবহার ছিল।

ছোটবেলায় আমি অনেকদিন ছেনিতে জলসেচ করেছি। একটা মজার ব্যাপার ছিল ছেনিতে জলসেচ করে আমি কখনো ক্লান্ত হতাম না। একদিকে আমি দড়ি ধরে দাঁড়াতাম অপরদিকে কোন মুনিস বা চাচাতো ভাই দাঁড়াত। অনেকক্ষণ ধরে জলসেচের পর আমার সামনের জন ক্লান্ত হয়ে সরে দাঁড়াত। আর একজনকে জুড়ে দিত। এভাবে অন্যদিকে মানুষ বদল হলেও আমি একদিকে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতাম। সেদিন বিকেলে আর আমার খেলা হত না।

কীটনাশক ছড়ানো হাত পিচকারী: এখনকার দিনে রং খেলার পিচকারির মতো দেখতে ছিল এই যন্ত্র। তবে প্লাস্টিকের নয়, স্টিল বা শক্ত টিন জাতীয় জিনিসের তৈরি দুই ফুট লম্বা চোঙ। সামনের দিকে ঝরনার মত চালুনি দেওয়া। বালতিতে বা বাতিল গুড়ের টিনের মধ্যে জলে কীটনাশক গুলে পিচকারী দিয়ে টেনে নিয়ে জমিতে ছড়ানো হত। অনেকদিন আগেই এই যন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

টুড়ি বা ঠুসি : বাঁশ বা কঞ্চির ছাল তুলে তৈরি গরুর মুখবন্ধ বিশেষ। গরুর মুখের মাপে তৈরি গোল টুপির মত জিনিস। জাফরি করার মতো ফাঁক ফাঁক করে বুনানো। ফলে মুখে টুড়ি থাকলেও গরুর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় না। ফসল ভরা মাঠ দিয়ে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় এই টুড়ি পরিয়ে দেওয়া হতো। তার ফলে গরু ফসল খেতে পারতো না। জমিতে লাঙল জোড়া হয়েছে, পাশের জমিতে সবুজ লকলকে ফসল আছে। চষতে চষতে সুযোগ পেলে গরুতে ফসলে মুখ দেবে। বারবার লাঙল সহ ফসলের ক্ষেতের দিকে টান মারবে। পাশের জমির ফসলের যেমন ক্ষতি হবে তেমনি কাজেও বিঘ্ন ঘটবে। এই বিনষ্টি ও বিঘ্ন থেকে মুক্তির জন্য গরুর মুখে টুড়ি পরিয়ে দেওয়া হতো। গরুতে ফসলে খেতে পারতো না, ফলে দু একবার চেষ্টা করে আর ফসলে মুখ দিত না। নির্বিঘ্নে

চাষের কাজ করা যেত। তাছাড়া দূর মাঠে জমি চষতে যেতে হবে , হয়ত মাঠের মাঝখানে জমি, চারিদিকে তখন ফসল। গরুর মুখে টুড়ি দিয়ে দড়ি ধরে আলপথে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো।

এখন মাঠময় ট্রাক্টর ঘোরে। ট্রাক্টরের চাষই বেশি। তবে এখনো গরুর লাঙল আছে। মাঝ মাঠে গরু নিয়ে যাওয়া হয়। তবে টুড়ির ব্যবহার খুবই কম। গরুর গলার দড়ি ধরে পাঁচন দেখিয়ে সাবধানে নিয়ে যায়।

ছোট বাছুর সহ গাই গরু মাঠে চরাতে গেলে বাছুরে যাতে গাই এর দুধ খেয়ে না নেয় তার জন্য বাছুরের মুখে টুড়ি পরানো হতো। আবার একসঙ্গে গোয়ালে কাছাকাছি বেঁধে রাখার সময় রাত্রে বেলায় বাছুরের মুখে টুড়ি দেওয়া হতো। যাতে করে বাছুরে গাইয়ের দুধ খেয়ে না ফেলে। এভাবে টুড়ির বহুল ব্যবহার দেখেছি ছোটবেলায়।

টুড়ি বুনানো লোক এখন খুব কম চোখে পড়ে। নেই বললেই চলে। হাটে-বাজারেও টুড়ির দেখা মেলা ভার।

মাথাল : মাথাল বাঁশের চটা ও খিল তুলে তৈরি সাহেবি গোল বড় টুপির মতন জিনিস। বাঁশের চটা ও খিল ছাড়াও লাগে তালপাতা বা বট পাতা বা শাল পাতা ও দড়ি। তৈরীর পর ভেতরের দিকে দড়ি দিয়ে জোত বাঁধা হয়। হাট বা বাজার থেকে মাথাল কিনে এনে কৃষকরাই এই জোত বেঁধে নেয়। দড়ির তৈরি এই বিশেষ ফাঁদে মাথা আটকে থাকে। কোথাও কোথাও এই দড়ির ফাঁস থুতনির নিচে নামানো হয়। এই জোত বাঁধাকে কোথাও কোথাও কানজোত বলে।

মাথালে চারটি স্তর থাকে। উপরে ও নিচের স্তর দুটি বাঁশের আর মাঝের দুটি হয় পাতার। শাল, তাল, কাঁঠাল যেকোনো এক প্রকার পাতার ছাউনি থাকে মাঝের স্তরে। উপরের স্তর বাঁশের চটা দিয়ে ঘন করে বুনানো। আর নিচের স্তরের বুনন জাফরির মতো ফাঁক ফাঁক। বাঁশ ও পাতা দিয়ে তৈরি বলে এতে যেমন তাপ শোষণ করে, মাথায় তাপ লাগতে দেয় না তেমনি জলও নিরোধক। বৃষ্টির জল আটকে দেয়।

আগের দিনে মানুষ মাঠে ঘাটে গেলে মাথায় অবশ্যই এই তাজ পরে নিত। চাষীর মাথার তাজই বলব একে। দারুন কাজের জিনিস ছিল এই মাথাল। ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের হতো। ছোট মাথাল গুলো বোঝা বহনের কাজে ব্যবহার হতো। বিশেষ করে পাট, ধানের বোঝা বহনের কাজে। আর আকারে বড় মাথাল গুলি শরীরকে রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষার কাজে ব্যবহার করত। প্রচন্ড রোদ পড়েছে, কৃষক মাথাল মুড়ি দিয়ে ঘাড় গুঁজে কাজ করে চলেছে। রোদ পিঠে লাগলেও মাথায়- মুখে-বুকে পড়ে না। মাথা ঠান্ডা তো শরীর ঠান্ডা। আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, বড় মাতাল মাথায় দিয়ে বৃষ্টির ছাটের দিকে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ো। পিঠ ভিজলেও মাথা বুক ভিজবে না।

মাথাল ছাড়া মাঠে চাষের কাজের কথা ভাবা যেত না। এখনকার ছেলেরা মাঠে গেলেও মাথাল নেয় না। মাথাল নিয়ে মাঠে যেতে তাদের বড় লজ্জা। জিন্স প্যান্ট, রঙিন গেঞ্জি, পায়ে চটি পরে তারা মাঠে যায়। মাথালের বদলে একটা গামছা নেয়। অবশ্য আগের দিনে কৃষকেরা মাথালের সাথে গামছাও নিতো।

মাথালের ব্যবহার কমায় মাথাল তৈরীর কারিগর এর সংখ্যা কমে গেছে। আমাদের পাশের গ্রাম সুমন নগর, মাধর পুকুর, বাঁশ চাতরে প্রচুর মানুষের আগের দিনের জীবিকা ছিল বাঁশের বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে বিক্রি করা। এখন দু-এক জন এই কাজের ধারা বয়ে নিয়ে চলেছে। তাও সারাবছর নয়।

আমাদের গাঁয়ে-ঘরে একটা কথা প্রচলিত আছে, মাথায় মারেনি মাথালে মেরেছে। পরোক্ষভাবে কেউ কাউকে মনে আঘাত দিয়ে কথা বললে এই কথাটাই বলে মানুষে। মারামারির কথা যখন উঠলো তখন মাথাল নিয়ে মারামারি একটি গল্প বলি। আমি তখন স্কুলে পড়ি। তবুও ঘটনাটা বেশ মনে আছে। সেবার আমাদের গ্রামের কলিম নানাদের সাথে মাঠের মাঝে পাশের গ্রামের কিছু মানুষের লড়াই হয়। একটি জমিকে কেন্দ্র করে এই লড়াই। জমির কাগজপত্রে কিছু গোলমাল ছিল। পাশের গ্রামের সাত-আটজন লোক জমি দখল করতে আসে। তখন ওই জমিতে কাজ করছিল কলিমরা তিন বাপ বেটা। ছয় সাত জনের হাতে বিভিন্ন অস্ত্র। লাঠি, বল্লম ,পাটটাঙি। এদের তিনজনের কাছে তেমন কিছুই নাই। কলিমের এক বেটাকে ওরা মেরে শাট করে দেয়। দাঁড়িয়ে তো আর মার খাওয়া যায় না। কলিম নানা মাথায় মাথালটা শক্ত করে বেঁধে নেয়। আর বাম হাতে একটা মাথাল ঢালের মতো শক্ত করে ধরে। ডান হাতে নেয় জমি কোপানো কোদাল। সাত জনের সামনে এগিয়ে যায় কলিম নানা। ওদের আঘাত মাথা আর হাতের মাথাল দিয়ে আটকে নেয়। আর কোদাল ঝেড়ে এক এক করে দু- জনকে মাটিতে পেড়ে ফেলে। একসময় কলিম নানা ভালো লাঠি খেলতে পারত। গায়ে তাকতও খুব। কলিম নানার আঘাতে এক মুহূর্তে দুজন পড়ে যায়। এবার তাদের একটা বল্লম তুলে নিয়ে জোর আঘাত হানে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আরও তিনজনকে মাটি সার করে দেয় কলিম নানা। বাপ ব্যাটা তিন জন আহত হয়। তবে যে পাঁচ জনকে কলিম নানা মেরেছিল তারা চার মাস বিছানাগত ছিল।

এই লড়াইয়ের গল্প আমাদের গ্রামে অনেকদিন মুখে মুখে ঘুরেছে। কলিম নানা বলত মাথাল দুটো না থাকলে সেদিন লড়াইয়ে দাঁড়াতে পারতাম না । মাথাল হাতে আর মাথায় থাকায় তাদের সব আঘাত আটকে দিয়ে তাদের ঘায়েল করেছি। মাথাল যে আত্মরক্ষা আর লড়াইয়ের অস্ত্র হতে পারে তা কলিম নানা সেদিন দেখিয়ে দিয়েছিল।

পানই বা চটকি : কৃষকের পরিশ্রমের দাম কোন কালে কেইবা দিয়েছে। তার শারীরিক সুরক্ষার কথাই বা কে ভেবেছে ? কেউ ভাবেনি। তাই নিজের সুরক্ষার কথা নিজেকে

ভাবতে হয়েছে। সারা বছর মাঠে মাঠে কাজ করায় পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়। শীতে পা ফেটে রক্ত পড়ে। ফাটা পায়ের গোড়ালির চামড়া এমন শক্ত হয়ে যায় যে শীতের রাতে শুতে গিয়ে লেপ কাঁথার ওয়াড় ছিঁড়ে যায়। ফাটা পা দিয়ে কখনো রক্ত পড়ে। কতদিন দেখেছি সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ভালো করে পা ধুঁয়ে চেরাগের সামনে বসত মেজ চাচা। পায়ের গোড়ালি ফেটে হাঁ। চেরাগ জ্বালানো পলতের মতো ছেঁড়া কাপড় পাকিয়ে নিত। এগুলো সরিষার তেলে (কখনো কখনো কেরোসিন তেলে) ভিজিয়ে প্রদীপ জ্বালানোর মতো জ্বালিয়ে নিত। পলতে ধরে আগুনের শিখা গোড়ালির ফাটা অংশে বারবার আঘাত করতো। তেল কালি আর তাপে জায়গাটা কালো হয়ে উঠত। অনেকক্ষণ ধরে পলতে মারত। এটাই ছিল আমার মেজ বাপের ফাটা গোড়ালির ব্যথা মারার ওষুধ। সন্ধ্যায় ব্যথা ব্যথা করত আর পলতে মারত। সকালে দিব্যি কাজে বেরিয়ে যেত। মনেই হতো না যে কাল পায়ে খুব ব্যথা ছিল।

শুধু মেজ চাচাই নয় অধিকাংশ চাষী মানুষদের পায়ের গোড়ালি এমনিভাবে ফেটে থাকত। শীতকালে তো বটেই অন্য সময়ে মাঝে মাঝে পা ক্ষতবিক্ষত হতো। হয়তো জলাজমিতে কাজ করছে পচা শামুকে পা কেটে গেল কিংবা চাষের সময় মোটা মোটা মাটির চাঁই উঠছে তাতে লেগে আঙ্গুল ফেটে গেল। এমন নানান বিপত্তি ঘটত। তা বলে কাজ বন্ধ থাকত না। খুব বাড়াবাড়ি না হলে কাজের মরসুমে একদিনও কামাই থাকতো না। ভাবতে অবাক লাগে কি কৈ মাছের প্রাণ ছিল তাদের। এখনকার মুনিসরা তাদের মত খাটতে পারে না। কষ্ট সইতে পারে না। একটু মাথা ধরলে তো আর মাঠেই যায় না। পায়ের আঙুল ফাটা তো দূরের কথা।

ধান কাটা, গম কাটা জমিতে হাল বাইতে গেলে পা ক্ষত বিক্ষত হয়। কারণ ধান কাটা জমির মাটি হয় খুব ধারালো। আর গম কাটা জমির মাটি যেমন শক্ত তেমনি গম গাছের গোড়া গুলি পেরেকের মতো ছুঁচালো। এই জমিতে হাল বাইতে গেলে পায়ে পানই পরতে হত। পানই হল বাস বা লরির টায়র কেটে হাওয়াই চপ্পলের মত বানানো চটি। এতে টায়ারেরই ফিতে লাগানো হত। বেশ মজবুত চপ্পল। ধারালো মাটির বা গমের খোঁচার জমিই হোক পায়ের কোন ক্ষতি করতে পারত না। এই পানই বা চটকি কাঁচা চামড়া দিয়েও তৈরি করা যেত। স্থানীয় মুচিদের কাছে তৈরি করে নিতো কৃষকরা। টায়ার বা চামড়ার বানানো চটকি জমি চাষ করার পক্ষে এটাই ছিল উপযুক্ত জিনিস। কেননা এতে পায়ে কোন চোট লাগার ভয় থাকত না।

এখন মানুষ মাঠে যায়। হাল বয়। কিন্তু পানই বা চটকি চোখে পড়ে না। প্লাস্টিকের যুগ। প্লাস্টিকের জুতো পরেই চাষ চলে। (ক্রমশ)

ব ই চ র্চা

দুই কাঁধের ফেরেশতা : মুসলমান সমাজজীবনের নিখুঁত ছবি

তরুণ গল্পকার গোলাম রাশিদের দশটি গল্প নিয়ে গল্প সংকলন 'দুই কাঁধের ফেরেশতা' (২০২১) প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রচলিত রীতিতে তিনি গল্প বলতে চাননি বলেই আমার মনে হয়েছে। কারণ দশটি গল্পেই একটা এলাকার জনজীবনের জীবন-জীবিকার ও ভাবনার সামঞ্জস্য আছে। সংলাপের ভাষা ব্যবহারেও তার বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে। গল্পকথক হিসেবে তিনি উত্তম পুরুষে যে ব্যক্তিটির মুখ দিয়ে গল্প উপস্থাপন করেছেন তাতে পাঠকের সর্বপ্রথম লেখককেই মনে হবে।

গল্পের চরিত্ররা অধিকাংশই মুসলিম নর-নারী। তারা হতদরিদ্র, জীবন-জীবিকার জন্য নানা ক্ষুন্নিবৃত্তিতে নিযুক্ত। অনেকে দেশ ছেড়ে অন্যান্য রাজ্যেও খাটতে যায়। তাদের জীবনচেতনা, ধর্মবিশ্বাস, কথন ভঙ্গি, আচার-আচরণ, মৃত্যুচেতনা এবং পরকাল বিষয়ের সবকিছুতেই ইসলামিক মিথের উল্লেখ আছে। ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারিবারিক ভাঙন, পরকীয়া, প্রেম, শরিয়ত-সুন্নাহ, জীবিকার টানাপোড়েন সবই গ্রাম্য হালচালের বাতাবরণে গড়ে ওঠা কাহিনি। কাহিনির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবনায় অন্তর্জীবনের কম্পন শোনা যায়। উপলব্ধি চারিত হয়।

'দুই কাঁধের ফেরেশতা' গল্পে দাদির মৃত্যুর পর গল্পকথক কলকাতা থেকে সোজা কবরস্থানে পৌঁছে দেখতে পায় সাদা পোশাকের প্রায় হাজারখানেক লোক। অবাক হয়ে ভাবতে থাকে এত লোকের উপস্থিতি। এখানেই টের পায় ফেরেশতাদের আগমন। ঘাড়ের দুই ফেরেশতা কিরামান ও কাতিবিন, যারা সর্বদা পাপ-পুণ্যের হিসাব লিখে চলেছে। দাদির পুণ্যের জোর ছিল তা গল্পেও উল্লিখিত আছে। মৃত্যু দেখে জীবিত মানুষের এই পরিণতির উদ্রেক হয়েছে। আমির নামের পাগলও চেতনা ফিরে পেয়েছে। 'পরের জায়গা পরের জমি' গল্পে হিন্দুপাড়ার ছেলেদের হাতে খুন হয় এক যুবক। যাকে কেউ হিন্দু আবার কেউ মুসলমান বলে মনে করত। কিন্তু তার আসল পরিচয় কেউ

জানে না। খুনের পর তার লাশের কবর হবে না চিতায় যাবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির রাতে লাশটি অদৃশ্য হয়ে যায়। গল্পকার সংযোজন করেন অসাম্প্রদায়িক হিন্দুর বাড়ির উঠোনে গোপনে তার কবর দেওয়া হয়। এই শেষটুকুই গল্পের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে হয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'ভারতবর্ষ' গল্পে দেখান মৃত এক অচেনা বৃদ্ধার লাশ জীবিত হয়ে উঠলে যুযুধান দুটি সম্প্রদায় বৃদ্ধার পরিচয় জানতে চায়। বৃদ্ধা একটাই উত্তর দেয়: 'আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে?" অর্থাৎ বৃদ্ধা একজন মানুষ, একজন ভারতবাসী, সব জাত-ধর্মের ঊর্ধ্বে। গোলাম রাশিদের গল্পেও এই সম্প্রীতির মানবিক ছায়া আছে। 'জিরেন কাটের রস' গল্পে রসের ঘ্রাণের সঙ্গে সদ্য কিশোরীর ঘ্রাণ যুবককে আকৃষ্ট করেছে। হয়তো এই কারণেই যুবকটির বিদেশ যাওয়া বন্ধ হতো। কিন্তু খেজুর গাছের চাষ করে তাকে রসের কারবারি করে তোলার ব্যাপারটি ঠিক মানানসই হয়নি। 'বিরান' গল্পে বৃষ্টিহীন শুষ্ক জমি এবং জমিতে বিষ্ঠা ত্যাগ ফসলহীন বন্ধ্যাত্ব ও কদর্যের ছায়া, যা মানবজীবনের প্রতিও ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে। 'সাদা কাফন' গল্পে ছাদ থেকে পড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু এবং সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আত্মীয়স্বজনদের বৃদ্ধার সম্পত্তির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি, শোকবিহ্বল পরিবেশ, তার মধ্যেও প্রেমের আবির্ভাব, বহুমুখী ভাবনার দেখা পাওয়া যায়। 'দিনের শেষে' গল্পে দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে দরিদ্র পীড়িত জীবনের ছবিটিও অসাধারণ রূপ পেয়েছে। সাপের দংশনে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছে স্বামীর পথ চেয়ে থেকে থেকে। একটি ছাগলকেও কত আপন করে নিয়েছে নিজের মতো। 'কুঁড়ি' প্রেমের গল্প। ভাবনায় আবর্তিত এবং উপলব্ধিতে গড়ে ওঠা বিন্যাস। ফুলের চারায় কখন কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে সেটিই লেখক তুলে ধরেছেন। এই ফুলের টবের মতোই জীবনও। প্রেম সেখানে মুকুলিত এক ভাষা।

গ্রন্থের সব গল্পগুলিতেই মুসলমান সমাজজীবনের নিখুঁত ছবি আছে। অতি সূক্ষ্ম বুনন আছে। আবার ইঙ্গিতময়তাও। গ্রাম কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, মানুষের রুচি-ভাবনারও কীভাবে পরিবর্তন ঘটছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। খেজুর পাতার তালাই বোনা, কাঁথা সেলাই করা, খেজুর রসের গুড় তৈরি করা সবকিছুই

যেন উঠে যেতে বসেছে। গ্রামজীবনের পরিবর্তমান সময় ধারাকেই গল্পকার গল্পের বাস্তবভিত্তিতে রূপ দিয়েছেন। এক সহজ সহজাত সাবলীলতায় গল্পগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

—তৈমুর খান

দুই কাঁধের ফেরেশতা: গোলাম রাশিদ, সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, বাগনান, হাওড়া, মূল্য:১৩৯ টাকা

শি ল্প চ র্চা

সাহিত্যের মতো সিনেমা

‘একাকীত্ব’, শব্দের অর্থ? হয় না। অথবা, অনেক গুলো অর্থ হয়, যেমন, নিজের সঙ্গে থাকা, স্মৃতির সঙ্গে থাকা। ‘একাকীত্ব’, একা হয়ে যাওয়া? নাকি, একা করে দেওয়া?

এ’সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে ২০১৯ সালে ইন্দ্রনীল দাশগুপ্তের পরিচালনায় পরিচালিত চলচ্চিত্র,‘কেদারা’। কিন্তু, সোজা নয়। কারণ, তাদের প্রশ্নে একাকীত্ব সাধারণ মানুষের নয়, একাকীত্ব শিল্পীর। সিনেমা শুরু হয় ডিপ ক্লোস-আপে। পর পর বিভিন্ন সাধারণ রোজের জিনিস আর কিছু শারীরিক অঙ্গের ডিপ ক্লোস-আপ। দুই চরিত্রের স্বর, একজনকে দর্শক দেখতে পায় না, অন্য জন অর্ধেক দৃশ্যমান। অর্ধেক দৃশ্যমান চরিত্র স্পষ্ট হয়, সকালের চা-খবরের কাগজ, রেডিওতে পুরোনো আকাশবাণী’র হরেক হেডলাইন। হেডলাইন শেষে অনেক চেষ্টায় প্রধান চরিত্র খবরের কাগজ দিয়ে একটা মাছি অবশেষে মারতে সক্ষম হয়, ছবির প্রথম পূর্ণ সংলাপ, ‘বহুদিন পর খবরের কাগজ কাজে লাগলো... ’। ‘কেদারা’ এমন এক সিনেমা, যে সিনেমার প্রতিটা ফ্রেম সুন্দর, প্রতিটা ফ্রেম গল্প বলে, কথা বলে, আমার আপনার কথা। ‘কেদারা’’-র সময়কাল নেই। ‘কেদারা’-র অতীত এবং বর্তমান সমসাময়িক এবং সমান্তরাল। ফেলে আসা দিন আমাদের জীবনের প্রতিমুহূর্তে মিশতে থাকে, সে মিশ্রণ মসৃণ। ‘কেদারা’-তেও ঠিক তাই। ‘কেদারা’-র প্রতি ফ্রেমে আলো আঁধারের ব্যবহার অতুলনীয়। আলো-ছায়া এ ছবির চরিত্র। অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো, শব্দ আর নৈঃশব্দ। নৈঃশব্দের ব্যবহার বেশি, শব্দ মাপা, প্রয়োজনীয়, সাময়িক। নৈঃশব্দের ব্যবহার এতটাই নিপুণ যে, ছবিজুড়ে কেবল অভ্যেসের শব্দ, অভ্যেস নেই, তার ছায়া নেই, কেবল শব্দ। শব্দের তিন অপূর্ব ব্যবহার—ট্রেনের শব্দ, স্কুল ছুটির শব্দ, বিমান এবং যুদ্ধবিমানের শব্দ-শৈশব, কৈশর, বার্ধক্য এবং স্মৃতি। মুখ্য ফ্রেমের আড়ালে চলতে থাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব ফ্রেম। ইমপ্রেশনিজম, ডাডাইজম, সুররিয়ালিজম এ’সবের শেষে সব ফ্রেম জীবনের কথা বলে। ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছোটো ছোটো মেটাফর একটা আরেকটার হাত ধরে বড় হয়, বড় হয় অপূর্ব কিছু মন্তাজে। ‘কেদারা’ সমাজের কথা বলে, জীবনের কথা বলে, একাকীত্বের কথা বলে, যৌনতার কথা বলে... আর বলে, এদের প্রত্যেকটি মানুষ দুইভাবে ব্যবহার করতে পারে, এক, যেমন তেমন রোজের মতো। নয় ভালোবেসে শিল্পের খাতিরে।

ছবির গল্প? গল্প নেই। জীবনেরও থাকে না। তাই জীবনের মতোই ছবিজুড়ে রয়েছে মুহূর্ত, মুহূর্তকে কেন্দ্র করে অন্য মুহূর্ত, মুহূর্তের বাইরে আরো কিছু মুহূর্ত। মুখ্য চরিত্র বর্তমানে বৃদ্ধ, যৌবনে ছিলেন শিল্পী। আজ তার পরিবার নেই, প্রতিবেশী নেই, কর্মক্ষেত্র নেই... তবু সে একা নয়। কারণ, তার শিল্প তাকে আজও ছেড়ে যায়নি। সে শিল্পের জন্য কাঁদে, শিল্পের জন্য বাঁচে, তার শিল্পকে উদ্দেশ্য করে সে বলে, '... শিল্প আমাদের মতোই, শিল্পের প্রাণ আছে, আজ তার শিল্প মৃত্যুমুখী। তাই সবাই ছেড়ে গেলেও সে শিল্পকে ছেড়ে যেতে পারবে না। কারণ সে শিল্পের আপনজন।' আমাদের মতো তার মুখোশ নেই, কারণ তার নিজের মুখটাই এখন তার মুখোশ। তার প্রিয় আসবাব সিনেমায় কেবল পুরোনো মূল্যবান আসবাব নয়। তার কেদারা তার 'আমি', তার 'অস্তিত্ব'।

পার্শ্ব চরিত্রটি বেশ ছোটো এবং পেশায় সে পুরোনো আসবাবের ব্যবসায়ী। এক দৃশ্যে, তার পছন্দের মানুষকে সে পুরনো জিনিস দিয়ে তার মনের কথা বলতে গেলে পছন্দের মানুষ সে জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে নতুনের কথা বলে। প্রত্যুত্তরে পার্শ্ব চরিত্র বলে, '.. তোর সবকিছু অরিজিনাল চাই বল? '। দর্শক নিজের দিকে তাকায়, প্রেক্ষাগৃহের ভিড়ের কথা মনে পড়ে।

ছবির গল্পের চেয়ে চিরকাল আমায় ছবির গঠনশৈলী বেশি ভাবায়। ছবির প্রতিটা ফ্রেম, ক্যামেরার ব্যবহার, আলোর ব্যবহার, শব্দের ব্যবহার, নৈঃশব্দের ব্যবহার এ'সব আমায় বেশি আকর্ষণ করে। সে কারণেই 'কেদারা' অন্যতম প্রিয়। 'কেদারা'-র শেষ-শুরু নেই। একটা সময়ে দর্শকের চিন্তা হয় ছবি কোন দিকে এগোবে, মুখ্য চরিত্র জীবনের যে স্থানে স্থির, আমরা সবাই সেই একই জায়গায় একই ভাবে স্থির। তবে এরপর? আরো কোথাও যাওয়ার আছে কি? না থাকলে ছবির কী হবে? তবু ছবি হয়, দর্শককে অবাক করে অন্যরকম শেষ হয়। দর্শক জানে শেষ, তবু সে মানতে নারাজ। দর্শক মনকে বোঝায়, অস্তিত্ব নেই, তবু হয়তো বেঁচে থাকাটা আছে।

'কেদারা' মনে করিয়ে দেয়, গণমাধ্যমের পাশাপাশি সিনেমা অবশ্যই শিল্প। চব্বিশ ফ্রেম/সেকেন্ড-কে নিজের মতো ভাঙা যায়, নিজের মতো গড়া যায়। পরিচালক চাইলেই তাকে যেমন তেমন ব্যবহার করতে পারে, আবার চাইলে তাকে শিল্পের রূপ দিতে পারে। 'কেদারা'-র কিছু দৃশ্য আজন্ম মনে থেকে যাবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের যে দুটো, এক, যে দৃশ্যে বিরতি হয়। আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্রে এমন দৃশ্য বিরল। অন্যটি, যে দৃশ্যে মুখ্য চরিত্র অনেকগুলো ল্যান্ডলাইনের মধ্যে একা...

একজন মানুষ, যার শৈশবে গ্রামের ছোঁয়া ছিলো, কৈশরে বিশ্বযুদ্ধ এবং যৌবনে নিজের শিল্প... আজ সে একা, বর্তমানে তার অতীতের সঙ্গে বসবাস। তার গল্প আপেক্ষিক দৃষ্টিতে তার একার হলেও, দৃষ্টির গভীরে সে গল্প আমাদের সবার।

'আসা যাওয়ার মাঝে' চলচ্চিত্রটি বড়পর্দায় কবিতা হলে, 'কেদারা' বড়পর্দায় আধুনিক সাহিত্য। সে কোন ঘরানার অধীনে বলা মুশকিল।

— সুবর্ণিকা ভট্টাচার্য